পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI

মঙ্গলবার, ১১ এপ্রিল ২০১৭

উত্তরণ

৮ পাতার এই রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

বই পড়ার উপকারিতা

বিদিশা রায়চৌধুরী

আধুনিক সমাজে বই ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করা যায় না। কেননা, বই-ই মানুষের মনশ্চক্ষু খুলে দেয়, জ্ঞান ও বুদ্ধিকে প্রসারিত ও বিকশিত করে এবং ভেতরে আলো জ্বেলে দেয়। মনুষ্যত্ব অর্জনের বড় পথও বই পড়া। বই পাঠ আসলে মানুষের একটি অপরিহার্য উপাদান। মূলত, মানসিক উৎকর্ষ সাধনে বই পাঠের কোনও বিকল্প নেই। বই পাঠের আলো মনে ও মননে নানাদিক থেকেই বিচ্ছুরিত হতে পারে। উৎকর্ষের বিবেচনায় বই পাঠ নানা রকম হতে পারে। কেউ হয়তো প্রকৃতি বিষয়ক বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করেন, কেউ ধর্ম বিষয়ক বই পড়ে জ্ঞান সঞ্চয় করেন, কেউ-বা আবার বিজ্ঞান বিষয়ে বই পড়ে বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে পড়েন। আবার এসব বিষয় একসঙ্গেও পড়া যায়। কেননা, মানুষের জ্ঞান শুধু প্রকৃতি কিংবা ধর্ম বা বিজ্ঞান বিষয়ক বই পাঠের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ নয়।

বস্তুত, জ্ঞানের কোনও সীমা নেই, চৌহদ্দি নেই। জ্ঞান অসীম অফুরন্ত। কোনও পাঠে বা দানে জ্ঞান হ্রাস পায় না, বরং যত জ্ঞান লাভ করা যায় ততই মনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। জ্ঞান পাঠের বিষয়, বুদ্ধি চর্চার বিষয়। আমরা প্রতিদিন যে নতুন নতুন জ্ঞানের সন্ধান করি, নিজেকে বিকশিত ও আলোকিত করি, তা বই পাঠেরই ফল। তাই বই ছাড়া কি আমাদের একদিনও চলে?

যাদের মানসিক ক্ষুধা প্রবল, জ্ঞান আহরণে উন্মুখ, তারা একবেলা অনাহারে থাকলেও কিছু যায় আসে না, কিন্তু তাঁদের বই না হলে চলে না। সেজন্যই হয়তো বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে বলা হয়েছে জ্ঞান আহরণের কথা। এবং এই কারণেও আমরা বই পড়ার আলাদা একটা গুরুত্ব অনুভব করি। এই জ্ঞানই পরবর্তীকালে নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে মানুষকে নানা ধরনের জ্ঞানে আলোকিত করে। আজকের জ্ঞানী মানুষরা সেই আলোকধারারই উজ্জ্বল ফসল। কিন্তু আমাদের সমাজে সবাই বই পড়ে না। অর্থাৎ বই পাঠে অভ্যস্ত নয়। এই কারণে, জ্ঞানের আলো এখনও তাদের দুয়ারে পৌঁছতে পারেনি। এছাড়া, আমাদের দেশে এখনও প্রচুর মানুষ নিরক্ষর থাকায় বই পড়া তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অথচ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জ্ঞানের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লেই পই পড়া সার্থক হবে, সম্ভব হবে। দেশে বাড়বে মেলার সংখ্যাও। এখন তো শুধু শহরেই বইমেলার আয়োজন করা হয়। বই পড়ার গুরুত্ব বুঝতে পারলে গ্রামের মানুষরাও বইমেলার প্রতি নিঃসন্দেহে আকৃষ্ট হবেন।

মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার পথও গ্রন্থ পাঠ। জ্ঞান তো একরকম হয় না। বইও এক রকম হয় না। সুতরাং সাধারণ মানুষও অনবরত পাঠচর্চার মাধ্যমে জ্ঞানী মানুষে পরিণত হতে পারে। জ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারে ও উৎকর্ষ সাধনে একজন সাধারণ মানুষও পণ্ডিত হয়ে উঠতে পারেন। বস্তুত, স্বশিক্ষিত মানুষই সুশিক্ষিত। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিও বই পড়েই জ্ঞানী হয়েছেন, কবি হয়েছেন এবং মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়েছেন। সব যুগেই বই পাঠের বিকল্প নেই। সৃষ্টি ঊষালগ্ন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মানুষ বই পড়ে। বই নির্জনে আমাদের বন্ধু, কোলাহলেও। বই সর্বাবস্থাতেই আমাদের সহায়ক শক্তি। বই জীবনকে আলোকিত করে, বিকশিত করে এবং পরিপূর্ণ করে। বই কোনোদিন মানুষের শত্রু হয় না। বরং বই পাঠে আমরা শত্রুকে মিত্র করতে পারি। এই আশ্চর্য গুণ শুধু বই পাঠেই সম্ভব। বই একটি সাঁকো, সুদূর অতীত থেকে বর্তমান এমনকী ভবিষ্যৎ পর্যন্ত এর ডানা বিস্তার করে আছে। আমরা এই সাঁকোতে চড়ে অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতেও চলে যেতে পারি।

অন্যদিকে, বই পড়ার সঙ্গে লাইব্রেরি কিংবা পাঠাগারেরও সম্পর্ক আছে। দেশে যত লাইব্রেরির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, তত বেশি পাঠক সংখ্যাও বাড়বে। ফলে দেশে জ্ঞানচর্চা বাড়বে। মানুষ বই পড়বে আনন্দে-উল্লাসে। এতে দেশে

এরপর ছয়ের পাতায়

দু'য়ের পাতায়

বিশেষ প্রবন্ধ

বাঙালির নতুন বছর

তিনের পাতায়

ক্লাস সেভেন-এর টিউশন

ভূগোল

ক্লাস এইট-এর টিউশন

বিজ্ঞান

চারের পাতায়

ক্লাস নাইন-এর টিউশন

ভৌতবিজ্ঞান

ক্লাস টেন-এর টিউশন

জীবন বিজ্ঞান

পাঁচের পাতায়

স্পেশাল টিউশন

বাংলা ব্যাকরণ

কম্পিউটার

ছয়ের পাতায়

ক্যুইজ ও এডু টিপস

সাত ও আটের পাতায়

জেনারেল নলেজ

ডিএনএ রহস্যের নেপথ্য কাহিনি

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

ভবিষ্যতের কথা ভেবে পড়

সোনা মণ্ডল শিক্ষিকা, ধুবুলিয়া সুভাষচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়, নদিয়া

পড়াশোনা নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হওয়া খুব দরকার। বারবার ছোট অংশ নিয়ে কম নম্বরে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে তাতে পরীক্ষা নিয়ে কারোর আর ভয়ের কোনও কারণ নেই। মাথায় আর চাপ নিয়ে পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে না। অনেকেই ভালো ফল করছে। পাস-ফেল উঠে যাওয়ায় অনেকেই আবার লেখাপড়াকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। কোনোমতে উতরে যাওয়ার মানসিকতা তাদের শিক্ষিত করে তুলতে পারছে না। পরীক্ষার পড়া আর শেখার মধ্যে বিভেদকে মাথায় রাখতে হবে। একটা বই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ার কোনও বিকল্প নেই। আর যেহেতু আলোচনাধর্মী বা ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের উত্তর আর সেভাবে দিতে হচ্ছে না তাই নিজের বিশ্লেষণী ক্ষমতার চর্চা নিজেকেই করতে হবে। নিজে লেখা বা অন্যান্য সৃজনশীল কাজ নিজের হাতে করতে হবে। বিদ্যালয় বা বাইরে নানা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া বা নানা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা খুব লাভজনক হতে পারে। এখনকার কারিক্যুলাম এমনভাবেই তৈরি করা হয়েছে যে সেখানে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা, আচরণ, নিয়মানুবর্তিতা সবই ভালো ফলের জন্যে আবশ্যিক হয়ে উঠছে। তাই অল্প পড়াশোনা করে ভালো রেজাল্ট করার ফন্দি করলে তাতে খুব একটা লাভ হবে না।

সকলের সুদূরপ্রসারী উন্নতির কথা ভেবে বলব শুধু পরীক্ষার কথা ভেবে যেন কেউ না পড়ে। ফাঁকি না দিলে সকলেই উন্নতি করবে।

'উত্তরণ'-এর মুখোমুখি | রোল নং ওয়ান

নিউজপেপার থেকে অনুবাদ করি

সুলক্ষণা পণ্ডিত অষ্টম শ্রেণি, হোলি ফ্যামিলি গার্লস হাই স্কুল, কৃষ্ণনগর

পড়াশোনাই ধ্যানজ্ঞান যার সেই সুলক্ষণার লক্ষ্য অনেক দূর। ডাক্তার হয়ে সে গ্রামের মানুষের চিকিৎসা করতে চায়। সারাদিনের ব্যস্ততায় পড়া ছাড়া অন্য কিছু করার এখন আর প্রায় কোনও সময় পাওয়া যায় না। তবুও তার মধ্যে নিজের জন্যে সময় বার করে বইয়ের পড়া ছাড়াও অন্যরকম কিছু করে। এভাবে সে নিজের লেখালিখি, প্রকাশের দক্ষতা ইত্যাদি জোরদার করে তোলার চেষ্টা করে। আজ আমরা সুলক্ষণার কাছ থেকেই তার কথা জানব।

উত্তরণ: তোমার দৈনিক রুটিন কী?

সুলক্ষণা: সকালে ৫.৩০টায় ঘুম থেকে উঠে পড়ি। আমি সকালে স্নান করে পড়তে বসি। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে ১ ঘণ্টা ঘুমিয়ে তারপর পড়তে বসি। আবার সন্ধেবেলায় সাড়ে ছ'টা থেকে ১০টা অবধি অন্তত পড়ি।

উত্তরণ: বাড়িতে কীভাবে পড়ো?

সুলক্ষণা: আমি সকালে আগে পড়ি আর তারপর সেটা লিখে অভ্যেস করি। আমি প্রতিদিন সন্ধেবেলায় অন্তত একঘণ্টা অঙ্ক করবই।

উত্তরণ: তোমার প্রিয় বিষয় কী?

সুলক্ষণা: বিজ্ঞান বিভাগের সব বিষয়ই পড়তে আমার ভালো লাগে।

উত্তরণ: বইয়ের পড়া ছাড়া আর কী করো?

সুলক্ষণা: নানারকম বই পড়তে খুব ভালো লাগে। এছাড়া নিউজপেপার পড়ি। বাবা প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটা দিনের নিউজ পেপার নিয়ে আলোচনা করেন ও সেখান থেকে অনুবাদ করতে দেন।

উত্তরণ: কোন খবরের কাগজ থেকে এটা করো?

সুলক্ষণা: টাইমস অব ইন্ডিয়া আর দ্য স্টেটসম্যান থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে হয়।

উত্তরণ: পড়া ছাড়া আর কী করো?

সুলক্ষণা: গান করি। রবীন্দ্রসংগীত ও ইংরেজি গান শুনি। অনেক সময় টিভি দেখি। ফ্রোজেন আর অবতার দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।

উত্তরণ: খেলাধুলো করার সুযোগ পাও?

সুলক্ষণা: আগে স্কুল থেকে এসে বিকেলে মাঠে খেলতাম। এখন সময় পাই না।

উত্তরণ: বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও?

সুলক্ষণা: আমি ডাক্তার হতে চাই। একজন কার্ডিওলজিস্ট।

উত্তরণ: তোমার স্বপ্ন পূরণ হোক।

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১১ এপ্রিল ২০১৭

কেন্দ্রের উদ্যোগে দুঃস্থ-মেধাবিদের স্কলারশিপ

দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। এর আগেও কেন্দ্রের পক্ষ থেকে মানুষের স্বার্থে বহু প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, এবার শিক্ষাক্ষেত্রে এক অনন্য নজির গড়ল মোদি সরকার।

দশম ও দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ ও যারা দশম ও দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত অথবা যারা তাদের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে তাদের স্কলারশিপ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মোদি সরকারের পক্ষ থেকে।

এই স্কলারশিপের নাম রাখা হয়েছে আব্দুল কালাম ও বাজপেয়ির নামে। এই স্কলারশিপের আওতায় থাকছে ওই সকল ছাত্রছাত্রীরা যারা ৭৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করবেন। তাদের কেন্দ্রের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে ১০ হাজার টাকার স্কলারশিপ। পাশাপাশি যে সকল মেধাবী পড়ুয়ারা দ্বাদশ শ্রেণি থেকে ৮৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হবে তারা ২৫ হাজার টাকা স্কলারশিপ পাবে। এই সংক্রান্ত ফর্ম ছাত্রছাত্রীরা পুর নিগম থেকে সংগ্রহ করতে পারবে। স্বাভাবিকভাবেই নরেন্দ্র মোদির এই উদ্যোগে খুশির হাওয়া ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষামহলে।

বাঙালির নতুন বছর

প্রিয়াঙ্কা দাস

বাংলা নববর্ষের ইতিহাস আকবরের আমলে ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু। ৪০০ বছরের বেশি সময় হয়ে গেল বাংলা নববর্ষ প্রচলন হওয়ার। এর আগে বাংলায় শকাব্দের প্রচলন ছিল। অর্থনৈতিক হিসেবনিকেশ আর বারো মাসের হিসাব একে-অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। একটা সময় অবধি দেশের অর্থনীতি অনেকটাই ছিল কৃষিনির্ভর। মুঘল সম্রাটরা যে হিজরি মতে বর্ষযাপন করতেন তার হিসাব হত চাঁদের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এর সঙ্গে বাংলার ফসল ফলনের মিল হত না। ফলে নতুন বছর আর খাজনার হিসাবে খুব সমস্যা হত। তখন বাংলার নববর্ষের হিসাবে বাংলার অর্থনৈতিক বছর চালু করা হল।

শুধু বাংলা নয় সঙ্গে অসম, ত্রিপুরার মতো রাজ্যেও এইভাবে বছরের হিসাব চালু হল। বাংলা বছরের উল্লেখ কিন্তু মধ্যযুগীয় সাহিত্যেও পাওয়া যায়। সেখানে 'বারোমাইস্যার' কথা আছে। কিন্তু বছরের প্রথম দিন উদ্‌যাপনের কথা আলাদা করে পাওয়া যায় না। বলা যায় ঘটা করে নববর্ষ উদ্‌যাপনের ভাবনা খানিকটা কলোনিয়াল প্রভাব। তবু বলতেই হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইংরেজদের খ্রিস্ট্রীয় নববর্ষ উদ্‌যাপনের চোখধাঁধানো আড়ম্বর কিন্তু বাঙালির মধ্যে শুরু থেকেই হারিয়ে যায়নি। আধুনিক সংস্কৃতির সূত্রপাত যে ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে তাদের নববর্ষ উদ্‌যাপনের মূলে ছিল স্বাদেশিকতার বিস্তার। জানা যায়

ঠাকুরবাড়ির আগে রাজনারায়ণ বসু ১৮৫১ থেকে ১৮৬৮ পর্যন্ত মেদিনীপুর উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময় প্রথমবাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন করে তখনকার শহুরে এলিট বাঙালিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

সাবেকি নববর্ষ উদ্‌যাপনে বাঙালি সংস্কৃতির খুঁটিনাটি রীতিনীতির ছাপ ছিল। এতে কিছু কিছু অদলবদল চোখে পড়লেও অনেক কিছু একই রকম রয়ে গেছে। প্রথমত, বছরের শেষ থেকেই অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তি থেকে শুরু হত আগামী বছরের প্রস্তুতি। পুরনো হিসেবনিকেশ, দেনা-পাওনা মিটিয়ে নতুন বছরে হিসেবের নতুন খাতা বা হালখাতা চালু করার রীতি ছিল। কিন্তু এখন মল, বড় বড় দোকানের ভিড়ে, 'চেইন বিজনেসে' শহুরে জীবনে হালখাতা খানিকটা হারিয়ে গেছে। তবুও ছোটখাটো ব্যবসাদার, মফস্‌সল আর গ্রামেগঞ্জে এখনও এর চল রয়েছে। হালখাতা মানেই শেষে মিষ্টিমুখ। তাতে মণ্ডার উপস্থিতি যেন অঘোষিতভাবে আবশ্যিক। একই সঙ্গে ভাঁড়ার খালি করতে চৈত্র সেলের যে রমরমা বাজার তা কিন্তু সব জায়গাতেই অটুট রয়েছে। দোকানে, মলে নানা সেলের সঙ্গে চৈত্র সেলেও হুড়িয়ে কেনাকাটা চলতে থাকে।

নববর্ষের সঙ্গে চড়কের মেলা জড়িয়ে রয়েছে। এর আয়োজন হয় চৈত্রসংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে। নানা জায়গায় মেলা, শারীরিক কসরত দেখানো চলে। এছাড়া নানারকমের মেলার আয়োজন দেখা যায় যেখানে বাংলার হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্পের রকমারি জিনিস কেনাবেচা হয়। ঘরে ঘরেও এইসব মেলায় পিঠেপুলির মতো বাংলা সাবেকি খাবার তৈরি ও বিক্রি হয়। বাংলাদেশে এখনও মেলার সঙ্গে কুস্তি, মল্লযুদ্ধের মতো শারীরিক কসরতের আসর বসে। নানা অনুষ্ঠান, যাত্রাপালার আয়োজন হয়। লোকসমাগমে আসর জমে ওঠে। মেলার প্রতি আকর্ষণ যেন নতুন প্রজন্মের একটু কমের দিকে। তাই মেলাও তার সাবেকি রূপ পালটাচ্ছে।

পুজোর মতো বাংলা নতুন বছরেও নতুন জামাকাপড়, ভালো খাওয়া তো হয়ই আর নতুন বাংলা বই ও নতুন বাংলা গান বাজারে আসে। ঘরে ঘরে নতুন বছরের পঞ্জিকা, দোকানে শোলার ফুল, আলপনা, পুজো দিয়ে বছর শুরুর রীতিও অনেক পুরনো। মন্দিরে পুজো দেওয়ার ভিড়ও এদিন উপচে পড়ে। শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্মের ফুলের রং সাদাকে মনে রেখে এই দিন সাদা-লালের মিশেলে সাজগোজ করার রীতি আছে। শহরেও অনেকেই এদিন রোজকার রুটিন ভেঙে শাড়ি ও পায়জামা-পাঞ্জাবি বা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে। লোকগীতি, বাংলা আধুনিক গান, রবীন্দ্রসংগীত, পল্লিগীতি ইত্যাদি সহযোগে বাংলা নববর্ষের আসর জমে ওঠে। খাওয়াদাওয়ার কথা বললে পুরনোদিনের কথা মনে করে অনেক প্রবীণই মুড়ি, চিড়ে, খই, বাতাসা, নাড়ু, ডাবের জলের কথা বলবেন। বাঙালির মিষ্টি রসগোল্লা তো সর্বকালে উপস্থিত। পান্তাভাতের সঙ্গে ইলিশ মাছ বেশিরভাগ বাঙালদের খাদ্যতালিকাতে নববর্ষে থাকতই থাকত। এছাড়া কই, খাসির মাংস এসব তো চিরন্তন। তবে বর্তমানে এই চিত্র খানিকটা পালটেছে। নিজেদের রান্নার ঝঞ্ঝাট না রেখে অনেকেই এই দিন ঘুরতে বেরোন, নানা অনুষ্ঠানে যোগ দেন আর বাইরে খাওয়াদাওয়া করেন। অন্যদিন চাইনিজ, লেবানিজ যাই খাওয়া হোক না কেন এই দিন বাঙালি খাবারের দোকানে বিশেষ মেনু আর উপচে পড়া ভিড় থাকে।

ইংরেজি নিউ ইয়ার পালনের সময় যে জৌলুস দেখা যায় যেমন, আলোর রোশনাই, গান আক নাচের শোরগোল, বাজির কান ফাটানো আওয়াজ তার তুলনায় বাংলার নববর্ষ উদ্‌যাপন অনেকটাই ঘরোয়া, ছিমছাম এবং অবশ্যই নিরুপদ্রব। তবুও এতেও নিউ ইয়ারের হাওয়া লাগছে বটে। বাজির আওয়াজ এখন এখানেও শোনা যায়। তবুও অনেকের আপ্রাণ চেষ্টা থাকে এতে যেন বাঙালির নিজস্ব ছাপ হারিয়ে না যায়। সেই বৈঠকি আড্ডায় গান, কবিতা, গল্পের হুল্লোড়, মিষ্টি মুখ আর ভালোবাসা বিনিময় যেন প্রতি বছর নববর্ষের সূচনা করে।

'উত্তরণ'-এর সকল পাঠককে নববর্ষের শুভেচ্ছা

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১১ এপ্রিল ২০১৭

ক্লাস সেভেন-এর টিউশন | ভূগোল

ভূমিরূপ

আজ আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করব ভূমিরূপ দিয়ে। প্রথমেই আমাদের জানতে হবে ভূমিরূপ বলতে কী বোঝায়? তোমরা জানো, আমাদের পৃথিবীর উপরটা (ভূপৃষ্ঠ) সব জায়গায় একরকম নয়। কোথাও উঁচু, কোথাও ঢেউ খেলানো আবার কোথাও বা নীচু সমতল। পৃথিবী পৃষ্ঠের ভূমির এই বৈচিত্রই হল ভূমিরূপ। মনে রাখবে, ভূমির আকৃতি, গঠন, উচ্চতা, ঢাল ও বন্ধুরতা অনুসারে ভূপৃষ্ঠের যে চেহারা তাকে ভূমিরূপ বলে। এবার আমাদের জানতে হবে ভূমিরূপ কী কী ভাগে বিভক্ত? উচ্চতা, গঠন ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পৃথিবীতে ভূমিরূপকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। ভূপৃষ্ঠের সব থেকে উঁচু অংশ হল পাহাড়-পর্বত, মাঝারি উঁচু অংশ হল মালভূমি ও সবথেকে নিচু, প্রায় সমতল অংশ হল সমভূমি।

ভূপৃষ্ঠের সব জায়গা একরকম নয় কেন?

পৃথিবীর উপর কোথাও পাহাড় কোথাও মালভূমি আবার কোথাও সমভূমি। এই সমস্ত রকম ভূমিরূপ মূলত দু'রকম শক্তির দ্বারা হয়েছে। একটা হল পৃথিবীর ভিতরকার শক্তি বা অভ্যন্তরীণ শক্তি আর অন্যটা হল বাইরের শক্তি বা বহির্জাত শক্তি।

জানো কি, তুমি যে ভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছো, সেটা স্থির নয়? ভূ-অভ্যন্তরে সারাক্ষণই আলোড়ন হচ্ছে। ভূপৃষ্ঠ অনেকগুলো ছোট, বড় পাত নিয়ে গঠিত।

মহাদেশ ও মহাসাগরগুলো এই পাতগুলির উপরে আছে। আর পাতগুলো একটা থকথকে স্তরের উপরে ভাসছে। ভাসতে ভাসতে পাতগুলো কখনও পরস্পরের দিকে এগিয়ে এসে ধাক্কা খায়, আবার কখনও দূরে সরে যায়, তখন ভূ-আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এটাই পৃথিবীর ভিতরকার শক্তি। এর ফলে পাহাড়, মালভূমি, সমভূমি সব রকমের ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। আর বাইরের শক্তিগুলি ভূমিরূপের উপর সবসময় কাজ করে কখনও ক্ষয় করে উচ্চতা কমিয়ে দেয়, আবার কোথাও সঞ্চয় করে ভূমিরূপের বৈচিত্র্য তৈরি করে।

পৃথিবী জুড়ে পর্বতের উচ্চতা ও আকৃতির অনেক বৈচিত্র আছে। এর কারণ পর্বত সৃষ্টির প্রক্রিয়া ও সময়ের পার্থক্য। এই কারণেই হিমালয়, আল্পস ইত্যাদি নবীন পর্বতগুলো অনেক উঁচু ও সুচলো চূড়াযুক্ত হয়। আবার আরাবল্লির মতো প্রাচীন পর্বতগুলো বহু বছর ধরে ক্ষয়ের ফলে উচ্চতা কমে যাওয়ায় চূড়াগুলো তেমন সুঁচালো নয়। সৃষ্টি অনুযায়ী পর্বত তিন ধরনের হয়:

ভঙ্গিল পর্বত: এই ধরনের পর্বত মূলত উঁচুনিচু ভাঁজ বিশিষ্ট হয়। ভূপৃষ্ঠের কোনও অংশে প্রবল পার্শ্বচাপের ফলে ভূ-ভাগে ক্রমোন্নতি-অবনতির সৃষ্টি হলে সেই স্থানে ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি হয়। এই ধরনের পর্বতগুলো কখনও কখনও ৫০০০ মিটারেরও অধিক উচ্চতা সম্পন্ন হয়ে থাকে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে এই ধরনের পর্বতের আধিক্য দেখা যায়। হিমালয়, আল্পস, অ্যাটলাস প্রভৃতি ভঙ্গিল পর্বতের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

স্তূপ পর্বত: ভূ-আলোড়নের ফলে অনেক সময় শিলাস্তরে ফাটল ধরে। ভূগর্ভের অভ্যন্তরীণ চাপে এই সকল ফাটলে ফাটলে শিলাস্তর খণ্ড খণ্ড স্তূপে পরিণত হয়ে যায়। সমান্তরাল দুই ফাটলের মধ্যবর্তী খণ্ডিত ভূমি অনেক সময়ে নীচের চাপে উপরে উঠে আসে। বড় আকারে উত্থিত স্তূপ কখনও কখনও পর্বতের আকার ধারণ করে। এইভাবে সৃষ্ট পর্বতকে বলা হয় স্তূপ পর্বত। এই ধরনের পর্বতের মাথা কিছুটা চ্যাপ্টা হয় এবং ঢাল বেশ খাড়া হয়। এই পর্বতে অনেক চ্যুতি ও গ্রস্ত উপত্যকাও দেখা যায়। স্তূপ পর্বতের উচ্চতা খুব বেশি হয় না। এই পর্বত ভঙ্গিল পর্বতের মতো বিশাল অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত হয় না। সাধারণত লম্বভাবে ভূ-আলোড়নের ফলে স্তূপ পর্বতের সৃষ্টি হয়ে থাকে। ভারতের দাক্ষিণাত্যের সাতপুরা, নীলগিরি, আন্নামালাই পর্বত, ফ্রান্সের ভোজ, জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট ইত্যাদি স্তূপ পর্বতের উদাহরণ।

আগ্নেয় বা সঞ্চয়জাত পর্বত: আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুতপাতের সময় ভূগর্ভের উত্তপ্ত গলিত তরল শিলা বা ম্যাগমা ভূস্তরের ফাটল দিয়ে লাভারূপে বাইরে বেরিয়ে এসে শীতল ও কঠিন হয়ে তিনকোণা শঙ্কুর মতো যে পর্বতের সৃষ্টি হয়, তাকে সঞ্চয়জাত পর্বত বা আগ্নেয় পর্বত বলে। ইতালির ভিসুভিয়াস, জাপানের ফুজিয়ামা, আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো এই জাতীয় পর্বতের উদাহরণ।

মালভূমি: আশপাশের অঞ্চলের সাপেক্ষে উঁচু বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ, অথচ যার পৃষ্ঠদেশ বা উপরিভাগ খুব অসমতল নয় এবং চারপাশ খাড়া ঢালযুক্ত থাকে তাকে মালভূমি বলা হয়।

ক্লাস এইট-এর টিউশন | বিজ্ঞান

তাপের পরিমাপ ও একক

আজ আমরা আলোচনা করব তাপের পরিমাপ ও একক নিয়ে। সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ, বস্তুর উষ্ণতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় তাপ নির্ভর করে বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিমাপের উপর। বস্তুর স্তরের উপর ও বস্তু কোন উপাদান দিয়ে তৈরি হয় তার উপর।

বস্তুর উষ্ণতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় তাপ নির্ভর করে— ১) বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিমাপ, ২) বস্তুর ভর, ৩) বস্তুর উপাদানের উপর।

তোমরা দেখেছ যে, গলানো মোমকে তরল অবস্থায় কিছুক্ষণ রেখে দিলে তা নিজে নিজেই শক্ত হয়ে যায়। আবার ফ্রিজে রাখা জলও জমে বরফ হয়ে যায়, তাও তোমরা জানো। তরল পদার্থ জমে কঠিন হবার সময় তরলটি তাপ ছেড়ে দেয়। তরল পদার্থ তাপ বর্জন করে যখন কঠিনে পরিণত হয় সেই ঘটনাকে বলে কঠিনীভবন। অবস্থার এই পরিবর্তনের সময়ও তরলটির উষ্ণতার কোনও পরিবর্তন হয় না।

তরল পদার্থ তাপ বর্জন করলে তা জমে কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। সেক্ষেত্রেও ঘটনাটি কোনও না কোনও নির্দিষ্ট উষ্ণতাতেই ঘটে। এক-এক ধরনের তরল পদার্থের ক্ষেত্রে এই উষ্ণতা এক-এক রকমের হয়। ওই নির্দিষ্ট উষ্ণতা ওই তরল পদার্থের হিমাঙ্ক।

গলনে ও কঠিনীভবনে আয়তনের পরিবর্তন:

কঠিন থেকে তরলে পরিণত হলে পদার্থখণ্ডটির আয়তন বাড়বে না কমবে?

নির্দিষ্ট ভরের কোনও পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনের সময় আয়তন কমলে ওই পদর্থের ঘনত্ব বাড়ে। ফলে কঠিনীভবনের পর পদার্থের ঘনত্ব সাধারণত বাড়ে।

চলো এবার একটি পরীক্ষা করা যাক—

দুটো টেস্টটিউবের একটিতে কিছুটা মোম এবং আরেকটিতে একটা বরফ টুকরো নেওয়া হোক। দু'টি টেস্টটিউবকে গরম করে মোম ও বরফকে গলানো হল। এবার যে টেস্টটিউবে গলানো মোম রয়েছে তাতে একটুকরো মোম ফেলে দাও। আর যে টেস্টটিউবে জল আছে তাতে একটা বরফের টুকরো ফেলে দাও। কী দেখা গেল?

কঠিন মোমের টুকরো তরল মোমের মধ্যে ডুবে যাবে। যদিও গরম তরল মোমের সংস্পর্শে কঠিন মোমের টুকরো খুব তাড়াতাড়ি গলে যাবে। কিন্তু বরফ টুকরো জলের উপর ভেসে থাকবে। কঠিন মোমের ঘনত্ব তরল মোমের ঘনত্বের তুলনায় বেশি। কিন্তু কঠিন বরফের ঘনত্ব জলের ঘনত্বের তুলনায় কম।

এবার নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো।

জল বরফে পরিণত হলে আয়তনে বাড়ে না কমে?

তরল মোম কঠিনে পরিণত হলে আয়তনে বাড়ে না কমে?

জল বরফে পরিণত হলে আয়তনে বাড়ে। এই ঘটনার সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। শীতপ্রধান দেশে মোটরের রেডিয়েটারে থাকা জল বরফে পরিণত হলে তা আয়তনে বাড়ে। অনেকক্ষেত্রে ওই পাইপ ফেটে যায়। শীতের দেশে বাড়ির জল সরবরাহের পাইপগুলিও কখনও কখনও ফেটে যায়। এই কারণে পাথরের মাঝখানে থাকা জল বরফে পরিণত হলে তা আয়তনে বাড়ে। এতে অনেক সময় পাথর ফেটে যায়। এই কারণে পাহাড়ে মাঝে মাঝেই ধস নামে। আবার বরফের ঘনত্ব জলের তুলনায় কম। জলের উপর বরফ ভেসে থাকে। বরফের তলায় জল থাকে। তাতে জলের জীবেরা বেঁচে থাকে।

কোনও কোনও তরল কঠিনে পরিণত হলে আয়তন বেড়ে যায় এবং ঘনত্ব কমে যায়। যেমন— ঢালাই লোহা, পিতল ইত্যাদি।

বাড়িতে যদি ছাঁচে ঢালা ধাতুর তৈরি মূর্তি থাকে, তবে জানার চেষ্টা করো মূর্তিটি কোন ধাতুর তৈরি? ধাতু গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে যে মূর্তিগুলি তৈরি করা হয় তা বিশেষ ধাতু ব্যবহার করে তৈরি করা হয় কেন?

দু'টি বরফ টুকরোকে একসঙ্গে কিছুক্ষণ চেপে ধরে রাখলে জোড়া লেগে যায় কেন?

বরফের গলনের ফলে যে জল উৎপন্ন হয়, তার আয়তন বরফের আয়তনের তুলনায় কমে যায়। চাপ বাড়ালে গলনে সাহায্য হয়। তাই চাপ বাড়লে বরফের গলনাঙ্ক কমে যায়। যখন চাপ সরিয়ে নেওয়া হয় তখন গলনাঙ্ক আবার বাড়ে ও গলে যাওয়া অংশ আবার বরফে পরিণত হয়। ফলে বরফের টুকরো দু'টি জুড়ে যায়। গলনের সময় বরফ, ঢালাই লোহা ইত্যাদি পদার্থের আয়তন কমে। এইসব পদার্থের ক্ষেত্রে চাপ বাড়ালে গলনাঙ্ক কমে যায়। মানে বেশি চাপে ওরা কম উষ্ণতায় গলে। গলনাঙ্ক যেহেতু চাপ বাড়লে বা কমালে বদলে যায়, তাই কোনও পদার্থের গলনাঙ্ক নির্ধারণ করার সময় চাপ কত ছিল তা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

সাধারণ জ্ঞান

- পৃথিবীর সবচেয়ে সরু রাষ্ট্র চিলি।
- অন্যদেশের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সীমান্ত আছে চিনে।
- ফিলিপাইনের মুদ্রার নাম পেসো।
- জুলু উপজাতির বাস দক্ষিণ আফ্রিকায়।
- সাত পাহাড়ের শহর রোম।
- পোপের শহর রোম
- নীরব শহর রোম।
- চির শান্তির শহর রাম
- ক্যাঙারুর দেশ অস্ট্রেলিয়া।
- ইউরোপের বুট ইটালি
- সোনালি আঁশের দেশ বাংলাদেশ।
- বজ্রপাতের দেশ ভুটান।
- সাদা শহর বেলগ্রেড।
- দ্বীপের মহাদেশ ওশেনিয়া।
- পবিত্র ভূমি জেরুজালেম।
- পবিত্র দেশ প্যালেস্তাইন।
- জাঁকজমকের নগরী নিউ ইয়র্ক।
- শ্বেতাঙ্গদের কবরস্তান গিনিকোস্ট।
- চির সবুজের দেশ নাটাল।
- চির বসন্তের নগরী কিটো।
- দ্বীপের নগরী ভেনিস।
- বাংলার ভেনিস বরিশাল।
- হর্ন অব আফ্রিকা ইথিওপিয়া।
- দক্ষিণের রানি সিডনি।
- রূপার শহর আলজিয়ারস।
- হাজার হ্রদের দেশ ফিনল্যান্ড।
- অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ আফ্রিকা।
- প্রাচীরের দেশ চিন।
- আফ্রিকার কিং ইথিওপিয়া।
- চিনের নীলনদ ইয়াংসিকিয়াং।
- হলদে নদী হোয়াংহো।
- সোভিয়েত ইউনিয়নের শস্যভাণ্ডার ইউক্রেন।
- প্রাচ্যের ভেনিস ব্যাংকক।
- পবিত্র পাহাড় ফুজিয়ামা।
- সূর্যোদয়ের দেশ জাপান।
- ভূমিকম্পের দেশ জাপান।

এরপর পাঁচের পাতায়

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১১ এপ্রিল ২০১৭

পড়াশোনায় উন্নতি লাভের উপায়

সাতের পাতার পর

এইরূপে বৈচিত্রের মধ্যে ক্লান্তি অপনোদন করে, তারপর আবার সেই গভীর বিষয়ের চর্চা আরম্ভ কর।' (ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের দেওয়া বক্তৃতা)

২৪) মনীষী জীবনী পাঠ: স্বামীজি বলেছেন, 'পৃথিবীর ইতিহাস কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষেরই ইতিহাস।' সেইসব আত্মবিশ্বাসী মানুষদের মূলমন্ত্রই হল 'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।' এইসব আত্মবিশ্বাসী মানুষদের জীবনী পাঠ করলে আত্মবিশ্বাস কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। আঁকেতিল, দ্যুপের, হেনরি টমাস, কোল ব্রুক, ইংরেজ দার্শনিক কার লাইন্স, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন প্রমুখের জীবনী আত্মপ্রচেষ্টা ও আত্মবিশ্বাসের এক-একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

২৫) প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ: প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের অন্যতম একটা উপায় হল শিক্ষামূলক ভ্রমণ। এতে বইয়ের পড়াটাকে প্রত্যক্ষ করার একটা সুযোগ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় উপায় হল 'হাতেকলমে কাজ', অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যালের ওপর জোর।

২৬) টিভির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নয়: জ্ঞানী মানুষেরা জীবনে টিভি দেখাটাকে অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করেননি। টিভিতে যে শিক্ষামূলক কিছু নেই, তা বলব না, তবে সচেতন না থাকলে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক।

২৭) উচ্চ লক্ষ্য থাকা চাই: যে শিক্ষার্থীর কোনও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই, সেই শিক্ষার্থী কখনও সফল হতে পারে না। নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দৃঢ় অধ্যবসায়শীল ছাত্র বা ছাত্রীই গৌরবের চূড়ায় পৌঁছতে পারে।

ক্লাস নাইন-এর টিউশন | ভৌতবিজ্ঞান

বল ও গতি

আজ আমরা আলোচনা করব বল ও গতি। চলো বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

স্থিতি— যে বস্তুর অবস্থান পারিপার্শ্বিকের তুলনায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় না, সেই বস্তুকে স্থির বস্তু বলে এবং বস্তুর ওই অবস্থাকে স্থিতি বলে।

গতি— যে বস্তুর অবস্থান পারিপার্শ্বিকের তুলনায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, সেই বস্তুকে গতিশীল বস্তু বলে।

স্থিতি ও গতি নির্ধারণে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা—

পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে আমরা একটি গাছকে স্থির অবস্থায় থাকতে দেখি। আবার চলন্ত ট্রেন থেকে দেখলে গাছকে গতিশীল বলে মনে হয়। কোনও বস্তুর স্থিতি বা গতি বর্ণনা করতে গেলে কারও সাপেক্ষে করতে হয় এবং যার সাপেক্ষে করতে হয়, তাকে বলে নির্দেশতন্ত্র।

এই পৃথিবীতে যে বস্তুকে আমরা স্থির দেখি, পৃথিবীর বাইরে থেকে তাকে গতিশীল মনে হবে, যেহেতু পৃথিবী ও পৃথিবী সংলগ্ন সব বস্তুই ঘুরছে। অতএব পরম স্থির বস্তু এই মহাবিশ্বে নেই। স্থিতি হল আপেক্ষিক।

একটি পরম স্থির বস্তুর সাপেক্ষে একটি বস্তু গতিশীল হলে বস্তুটির গতিকে পরম গতি বলে। কিন্তু পরম স্থির বস্তু এই মহাবিশ্বে নেই। তাই পরম গতি বলে কিছু নেই। গতি হল আপেক্ষিক।

গতির প্রকারভেদ—

১) রৈখিক গতি বা চলন গতি— কোনও বস্তু সরলরেখা বরাবর গতিশীল হলে এবং বস্তুটির

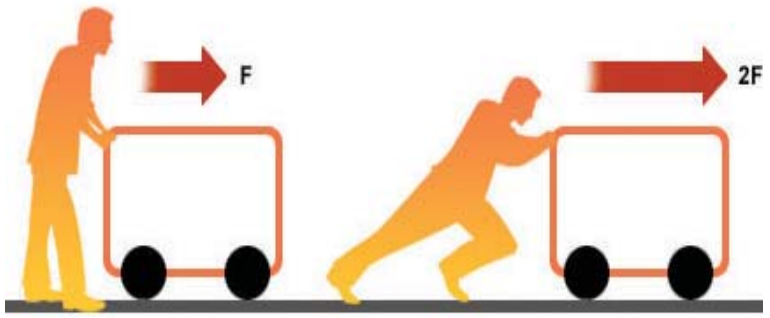

প্রত্যেকটি কণা নির্দিষ্ট সময়ে সমান্তরালভাবে সরলরেখায় একই দূরত্ব অতিক্রম করলে, সেই বস্তুর গতিকে রৈখিক গতি বা চলন গতি বলে।

২) বৃত্তীয় গতি— কোনও বস্তু কণা একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকলে ওই কণাটির গতিকে বৃত্তীয় গতি বলে।

৩) ঘূর্ণন গতি—একটি বিস্তৃত বস্তু যদি নিজের অক্ষের সাপেক্ষে চারদিকে আবর্তন করে তাহলে বস্তুটির গতিকে ঘূর্ণন গতি বলে।

৪) মিশ্র গতি বা জটিল গতি—যদি কোনও বস্তুর গতি চলন ও ঘূর্ণন গতির সংমিশ্রণে সম্পন্ন হয় তাহলে সেই বস্তুর গতিকে মিশ্র গতি বা জটিল গতি বলে।

৫) সরল রৈখিক দোলগতি—সরল রৈখিক পথে কোনও বস্তুকণার উপর ক্রিয়াশীল বল যদি কণাটির গতিপথের মধ্যবিন্দু বরাবর অভিমুখী হয় এবং ওই বিন্দু থেকে কণাটির সরণের সমানুপাতিক হয়, তাহলে ওই বলের অধীনে বস্তুকণাটির গতিকে সরল রৈখিক দোলগতি বলে। এই গতিকে একধরনের সরল পর্যাবৃত্ত গতি বলে।

সরল রৈখিক দোলগতির বৈশিষ্ট—১) সরল রৈখিক দোলগতি হল সরল পর্যাবৃত্ত গতি। ২) এক্ষেত্রে কণার উপর ক্রিয়াশীল বল অথবা কণাটির ত্বরণ সর্বদা কণাটির গতিপথের মধ্যবিন্দু অভিমুখী হয়। ৩) এই গতিবিশিষ্ট কণার উপর ক্রিয়াশীল বল অথবা কণাটির ত্বরণ মধ্যবিন্দু থেকে সরণের সমানুপাতিক হয়।

গতির সমীকরণ

দূরত্ব— সময়ের সঙ্গে একটি বস্তু বা কণার অবস্থানের পরিবর্তন হলে, তার প্রাথমিক ও অন্তিম অবস্থানের মাঝে অতিক্রান্ত পথের দৈর্ঘ্য হল ওই বস্তু বা কণা দ্বারা অতিক্রান্ত দূরত্ব। দূরত্বের মান আছে কিন্তু অভিমুখ নেই, তাই দূরত্ব হল স্কেলার রাশি।

সরণ— সময়ের সঙ্গে একটি বস্তু বা কণার অবস্থানের পরিবর্তন হলে তার প্রাথমিক ও অন্তিম অবস্থানের মাঝে সরলরৈখিক দূরত্ব হল বস্তু বা কণাটির সরণ।

দ্রুতি—একটি কণা বা বস্তুর সময়ের সাপেক্ষে অবস্থানের পরিবর্তনের হারকে ওই কণা বা বস্তুটির দ্রুতি বলে।

সমদ্রুতি— যদি কোনও কণা বা বস্তু সমান ব্যবধানে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে কণা বা বস্তুটির দ্রুতিকে সমদ্রুতি বলে।

অসমদ্রুতি—যদি কোনও কণা বা বস্তু সমান সময়ের ব্যবধানে অসমান দূরত্ব অতিক্রম করে, তাহলে কণা বা বস্তুটির দ্রুতিকে অসমদ্রুতি বলে।

বেগ— সময়ের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট দিকে কোনও সচল বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের হারকে ওই বস্তুর বেগ বলে।

সমবেগ— যদি কোনও কণা বা বস্তু সমান সময়ের ব্যবধানে একই দিকে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে, তাহলে কণা বা বস্তুটির বেগকে সমবেগ বলে।

অসমবেগ— যদি কোনও কণা বা বস্তুর বেগের শুধু মান, অথবা শুধু অভিমুখ, অথবা মান ও অভিমুখ উভয়েই সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় তাহলে কণা বা বস্তুটির বেগকে অসমবেগ বলে।

ক্লাস টেন-এর টিউশন | জীবন বিজ্ঞান

স্নায়ু

স্নায়ুকোষ, স্নায়ুতন্তু এবং স্নায়ুর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক

স্নায়ুকোষ বা নিউরোন হল স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত ও কার্যগত একক। স্নায়ুকোষের অ্যাক্সনকে সাধারণভাবে স্নায়ুতন্তু বলে। এই স্নায়ুতন্তুর ওপর যে যোগ কলার আবরণ থাকে, তাকে এন্ডোনিউরিয়াম বলে। এই এন্ডোনিউরিয়াম আবরণযুক্ত কয়েকটি স্নায়ুতন্তু আবার পেরিনিউরিয়াম নামক আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। কিছুক্ষেত্রে পেরিনিউরিয়াম আবরণযুক্ত কয়েকটি স্নায়ুতন্তুগুচ্ছ একত্রে এপিনিউরিয়াম নামক যোগকলার আবরণ দ্বারা আবৃত হয়ে স্নায়ু গঠন করে। স্নায়ুর এই যোগকলার আবরণগুলি রক্তবাহ সমন্বিত হয়। কাজেই আমরা বলতে পারি রক্তবাহ সমন্বিত এবং যোগকলার আবরণ দ্বারা আবৃত স্নায়ুতন্তু বা স্নায়ুতন্তুগুচ্ছকে স্নায়ু বা নার্ভ বলে। এই স্নায়ু দ্বারা স্নায়ুতন্ত্র গঠিত হয়। যার মাধ্যমে প্রাণীরা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনায় সাড়া দেয় এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় করে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

স্নায়ুর প্রকারভেদ

১) বহির্বাহী স্নায়ু—চেষ্টীয় নিউরোনের স্নায়ুতন্তু দ্বারা গঠিত যে স্নায়ু সাড়া বা রেসপন্সকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে কারক বা ইফেক্টর বহন করে নিয়ে যায়, তাদের বহির্বাহী স্নায়ু বা চেষ্টীয় স্নায়ু বা মোটর নার্ভ বলে।

উদাহরণ—অকিউলোমোটর, ট্রকলিয়ার ইত্যাদি।

২) অন্তর্বাহী স্নায়ু—সেনসরি নিউরোন স্নায়ুতন্তু দ্বারা গঠিত যে স্নায়ু স্নায়বিক উদ্দীপনাকে গ্রাহক বা রিসেপ্টর থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে বহন করে নিয়ে যায়, তাদের অন্তর্বাহী স্নায়ু বা সংজ্ঞাবহ স্নায়ু বা সেনসরি নার্ভ বলে।

উদাহরণ—অলফ্যাক্টরি, অপটিক ইত্যাদি।

৩) মিশ্র স্নায়ু— সেনসরি এবং মোটর উভয় প্রকার নিউরোনের স্নায়ুতন্তু দ্বারা গঠিত যে স্নায়ু রিসেপ্টর থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে ইফেক্টরে স্নায়ুস্পন্দন বহন করে নিয়ে যায়, তাদের মিশ্র স্নায়ু বলে।

উদাহরণ—ভেগাস, ফেসিয়াল।

স্নায়ুগ্রন্থি— একাধিক নিউরোনের কোষদেহগুলি আবরণবেষ্টিত হয়ে যে স্ফীত গ্রন্থির সৃষ্টি করে, তাকে স্নায়ুগ্রন্থি বা নার্ভ গ্যাংলিয়ন বলে।

কাজ—১) স্নায়ুগ্রন্থির নিউরোসিক্রেশন সিক্ত রাখে। ২) স্নায়ুগ্রন্থি থেকে স্নায়ুর সৃষ্টি হয়। ৩) অমেরুদন্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে স্নায়ুগ্রন্থি থেকে নিউরোসিক্রেটরি হরমোন ক্ষরিত হয়। ৪) স্নায়ুসন্নিধি—পরপর অবস্থিত দুটি নিউরোনের মধ্যে একটি নিউরোনের অ্যাক্সনপ্রান্ত এবং পরবর্তী নিউরোনের ডেনড্রাইট বা কোষদেহ বা অ্যাক্সনের সংযোগস্থলকে স্নায়ুসন্নিধি বা সাইন্যাপস বলে।

প্রকারভেদ— ১) অ্যাক্সোডেনড্রাইটিক সাইন্যাপস: প্রিসাইন্যাপটিক নিউরোনের অ্যাক্সোনপ্রান্ত এবং পোস্ট সাইন্যাপটিক নিউরোনের ডেনড্রাইটের মধ্যে সাইন্যাপস গঠিত হয়।

২) অ্যাক্সোসোমাটিক সাইন্যাপস: প্রিসাইন্যাপটিক নিউরোনের অ্যাক্সোনপ্রান্ত এবং পোস্ট সাইন্যাপটিক নিউরোনের কোষদেহের মধ্যে সাইন্যাপস গঠিত হয়।

৩) অ্যাক্সো-অ্যাক্সোনিক সাইন্যাপস: প্রিসাইন্যাপটিক নিউরোনের অ্যাক্সোনপ্রান্ত এবং পোস্ট সাইন্যাপটিক নিউরোনের অ্যাক্সোনের মধ্যে সাইন্যাপস গঠিত হয়।

সাইন্যাপসের গঠন— প্রিসাইন্যাপটিক নিউরোনের অ্যাক্সোনের প্রান্তবুরুশের শেষপ্রান্ত স্ফীত হয়ে বোতামের ন্যায় প্রিসাইন্যাপটিক নব গঠন করে। এই প্রিসাইন্যাপটিক নবের ঝিল্লিকে প্রিসাইন্যাপটিক ঝিল্লি বলে। এই প্রিসাইন্যাপটিক নবের মধ্যে বহুসংখ্যক মাইটোকন্ড্রিয়া এবং অসংখ্য গোলাকার ক্ষুদ্রাকৃতি সাইন্যাপটিক থলি বর্তমান। এই সাইন্যাপটিক থলির মধ্যে অ্যাসিটাইল কোলিন নামক রাসায়নিক পদার্থ বা নিউরোট্রান্সমিটার থাকে, যা স্নায়ুস্পন্দন পরিবহণ করে। সাইন্যাপস গঠনকারী নিউরোন বা পোস্ট সাইন্যাপটিক নিউরোনের ডেনড্রন বা কোষদেহের কোষপর্দাকে পোস্ট সাইন্যাপটিক ঝিল্লি বা পোস্ট সাইন্যাপটিক মেমব্রেন বলে। প্রিসাইন্যাপটিক মেমব্রেন ও পোস্ট সাইন্যাপটিক মেমব্রেনের মাঝে প্রায় 200A ব্যাস সম্পন্ন যে ফাঁকা স্থানটি থাকে, তাকে সাইন্যাপটিক ক্লেফট বলে। এই সাইন্যাপটিক ক্লেফট অঞ্চলটি নিউরোহিউমর নামক তরল পদার্থ পূর্ণ থাকে। অ্যাসিটাইল কোহিল একটি উত্তেজক নিউরোট্রান্সমিটার, যা স্নায়ুস্পন্দনকে সাইন্যাপসের মাধ্যমে পূর্ববর্তী নিউরোনে বহন করে।

সাইন্যাপসের কাজ— সাইন্যাপস বা স্নায়ুসন্নিধি স্নায়ুস্পন্দনকে প্রিসাইন্যাপটিক নিউরোন থেকে পোস্ট সাইন্যাপটিক নিউরোনে প্রবাহিত করে।

স্নায়ুতন্ত্রের প্রকারভেদ—স্নায়ুকলা দ্বারা গঠিত, গ্রাহক অঙ্গ এবং কারক অঙ্গসহ যে তন্ত্রের মাধ্যমে প্রাণিদেহ উদ্দীপনা গ্রহণ এবং সেই উদ্দীপনা সাড়া দিয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে সমন্বয়সাধন ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে, তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র—কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র মস্তিস্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড দিয়ে তৈরি। মস্তিষ্কটি করোটির মধ্যে এবং সুষুম্নাকাণ্ডটি মেরুদণ্ডের নিউরোল ক্যানেলের মধ্যে সুরক্ষিত থাকে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র মেনিনজেস নামক পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। মেনিনজেস তিনটি স্তর দ্বারা গঠিত। বাইরের স্তরটিকে ডুরাম্যাটার, মাঝের স্তরটিকে অ্যারাকনয়েড ম্যাটার, এবং ভিতরের স্তরটিকে পায়াম্যাটার বলে। মানুষের মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড ফাঁপা। মস্তিষ্কের ফাঁপা স্থানটিকে ভেন্ট্রিকল বলে।

তরঙ্গ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১১ এপ্রিল ২০১৭

স্পেশাল টিউশন | বাংলা ব্যাকরণ

বাক্য রূপান্তর

আজ আমরা পড়ব বাক্য রূপান্তর।

অর্থের কোনোরকম পরিবর্তন না করে একপ্রকারের বাক্যকে অন্য প্রকার বাক্যে রূপান্তর করার নামই বাক্য রূপান্তর।

ক) সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর

মিশ্র বাক্যের সংযোগচিহ্ন: যদি, তবে, যে, সে, যারা-তারা, যে-সেই, যেই-সেই, যে-তাকে/তারা, যা-তা, যেসব-তাদের/যেসকল-তারা, যাদের-তাদের/তারাই, যে-সেটি

সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনও অংশকে খণ্ডবাক্যে পরিণত করতে হয় এবং উভয়ের সংযোগ বিধানে সম্বন্ধসূচক (যদি, তবে, যে, সে প্রভৃতি) পদের সাহায্যে উক্ত খণ্ডবাক্য ও প্রধান বাক্যটিকে পরস্পর সাপেক্ষ করতে হয়।

১. (সরল বাক্য) ভালো ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে। (মিশ্র বাক্য) যারা ভালো ছেলে তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

২. (সরল বাক্য) তার দর্শনমাত্রই আমরা প্রস্থান করলাম। (মিশ্র বাক্য) যেই তার দর্শন পেলাম সেই আমরা প্রস্থান করলাম।

৩. সরল বাক্য: ভিক্ষুককে দান কর।

মিশ্র বাক্য: যে ভিক্ষা চায় তাকে দান কর।

খ) মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর: মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মিশ্র বাক্যের অপ্রধান খণ্ডবাক্যটিকে সংকুচিত করে একটি পদ বা একটি বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যেমন :

১. (মিশ্র বাক্য) যাদের বুদ্ধি নেই তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে। (সরল বাক্য) নির্বোধরা/বুদ্ধিহীনরা এ কথা বিশ্বাস করবে।

২. (মিশ্র বাক্য) যতদিন জীবিত থাকব ততদিন এ ঋণ স্বীকার করব। (সরল বাক্য) আজীবন এ ঋণ স্বীকার করব।

৩. (মিশ্র বাক্য) যে সকল পশু মাংস ভোজন করে তারা অত্যন্ত বলবান। (সরল বাক্য) মাংসভোজী পশু অত্যন্ত বলবান।

গ) সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

যৌগিক বাক্যের সংযোগচিহ্ন: এবং, কিন্তু, তথাপি, তবে, তাই।

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনও অংশকে নিরপেক্ষ বাক্যে রূপান্তর করতে হয়। এবং যথাসম্ভব সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়ের প্রয়োগ করতে হয়। যেমন :

১. (সরল বাক্য) তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন। (যৌগিক বাক্য) তিনি আমাকে পাঁচটি টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।

২. (সরল বাক্য) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত। (যৌগিক বাক্য) এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত তবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে।

৩. (সরল বাক্য) আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি। (যৌগিক বাক্য) আমি বহু কষ্ট করেছি ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।

ঘ) যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে

১. বাক্যসমূহের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রাখতে হয়।

২. অন্যান্য সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হয়।

৩. অব্যয় পদ থাকলে তা বর্জন করতে হয়।

৪. কোনও কোনও স্থলে একটি বাক্যকে হেতুবোধক বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যেমন:

১. (যৌগিক বাক্য) সত্য কথা বলিনি তাই বিপদে পড়েছি। (সরল বাক্য) সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

২. (যৌগিক বাক্য) তার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয়নি। (সরল বাক্য) তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।

৩. (যৌগিক বাক্য) মেঘ গর্জন করে তবে ময়ূর নৃত্য করে। (সরল বাক্য) মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।

ঙ) যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর

যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত পরস্পর নিরপেক্ষ বাক্য দু'টির প্রথমটির পূর্বে 'যদি' কিংবা 'যদিও' এবং দ্বিতীয়টির পূর্বে 'তাহলে' (তাহা হইলে) কিংবা 'তথাপি' অব্যয়গুলো ব্যবহার করতে হয়। যেমন:

১. (যৌগিক বাক্য) দোষ স্বীকার করো তবে তোমাকে কোনও শাস্তি দেব না। (মিশ্র বাক্য) যদি দোষ স্বীকার করো তাহলে তোমাকে কোনও শাস্তি দেব না।

২. (যৌগিক বাক্য) তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ। (মিশ্র বাক্য) যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র তথাপি তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।

সাপেক্ষ অব্যয়ের সাহায্যেও যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিবর্তন করা যায়। যেমন:

৩. (যৌগিক বাক্য) এ গ্রামে একটি পীঠস্থান আছে সেটি পাঠানযুগে নির্মিত হয়েছে। (মিশ্র বাক্য) এ গ্রামে যে পীঠস্থান আছে সেটি পাঠানযুগে নির্মিত হয়েছে।

চ) মিশ্র বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

মিশ্র বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন করতে হলে খণ্ডবাক্যকে এক-একটি স্বাধীন বাক্যে পরিবর্তন করে তাদের মধ্যে সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার করতে হয়। যেমন :

১. (মিশ্র বাক্য) যদি সে কাল আসে তাহলে আমি যাব। (যৌগিক বাক্য) সে কাল আসবে এবং আমি যাব।

২. (মিশ্র বাক্য) যখন বিপদ আসে তখন দুঃখও আসে। (যৌগিক বাক্য) বিপদ এবং দুঃখ একসময়ে আসে।

৩. (মিশ্র বাক্য) যদিও তাঁর টাকা আছে তথাপি তিনি দান করেন না। (যৌগিক বাক্য) তাঁর টাকা আছে কিন্তু তিনি দান করেন না।

বাক্য বিশ্লেষণ

সংজ্ঞা: বাক্যের বিভিন্ন অংশ পৃথক করে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় প্রণালীকে বাক্য বিশ্লেষণ বলে।

ক) সরল বাক্যের বিশ্লেষণ

১. মহারাজ শুদ্ধোধনের পুত্র শাক্যসিংহ যৌবনে সংসার ত্যাগ করেন।

ওপরে লিখিত বাক্যটিকে চারটি অংশে বিশ্লেষণ করতে হবে। যেমন: উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক, বিধেয়, বিধেয়ের সম্প্রসারণ।

বিশ্লেষণ: উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক—উদ্দেশ্য—বিধেয়ের সম্প্রসারক—বিধেয়

১. মহারাজ শুদ্ধোধনের পুত্র—শাক্যসিংহ—যৌবনে সংসার—ত্যাগ করেন।

খ) মিশ্র বাক্যের বিশ্লেষণ

মিশ্র বাক্যের বিশ্লেষণ করতে হলে—

১. প্রথমে প্রধান বাক্যটি প্রদর্শন করতে হয়।

২. খণ্ডবাক্য (গুলো) প্রদর্শন করে তাদের সঙ্গে প্রধান বাক্যের সম্বন্ধ উল্লেখ করতে হয়।

৩. প্রধান ও অপ্রধান খণ্ডবাক্যের মধ্যে কোনও সংযোজক পদ থাকলে তাও দেখাতে হয়। যেমন:

আমি স্থির করলাম যে, এরূপ অল্প বয়স্ক বালককে পাঠাব না। এখানে প্রধান বাক্য (১) আমি স্থির করলাম।

সংযোজক পদ— যে, বিশেষ্য-স্থানীয়-খণ্ডবাক্য (২) অল্প বয়স্ক বালককে পাঠাব না।

বিশ্লেষণ: উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক—উদ্দেশ্য—বিধেয়ের সম্প্রসারক—বিধেয়—সংযোজক বা সাপেক্ষ অব্যয়

১. আমি—অল্প বয়স্ক বালককে—স্থির করলাম—যে

২. (আমি) (উহ্য) পাঠাব না। এবং

গ) যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ

যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ করতে হলে

১. প্রত্যেকটি স্বাধীন বা নিরপেক্ষ বাক্যকে সরল বাক্যের ন্যায় বিশ্লেষণ করতে হবে।

২. কোনও সংযোজক অব্যয় থাকলে তা প্রদর্শন করতে হবে। যেমন: ত্যাগ এবং জ্ঞান মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে। এখানে দু'টি বাক্য আছে। যেমন:

১. ত্যাগ মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে।

২. জ্ঞান মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে। বাক্য দু'টির সংযোজক অব্যয় এবং'।

বিশ্লেষণ: উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক—উদ্দেশ্য—বিধেয়ের সম্প্রসারক—বিধেয়—সংযোজক অব্যয়

ত্যাগ—মানুষকে মুক্তির পথে—পরিচালিত করে—এবং—জ্ঞান—মানুষকে মুক্তির পথে—পরিচালিত করে।

সাধারণ জ্ঞান

- প্রাচ্যের গ্রেট ব্রিটেন জাপান।
- পৃথিবীর ছাদ পামির মালভূমি।
- মুক্তার দ্বীপ বাহরাইন।
- ভূমধ্যসাগরের প্রবেশদ্বার জিব্রালটার।
- পান্নার দ্বীপ আয়ারল্যান্ড।
- নিষিদ্ধ শহর লাসা।
- হারকিউলিসের স্তম্ভ জিব্রালটার মালভূমিতে অবস্থিত।
- মেডিটেরিয়নের দেশ জিব্রালটার।
- পিরামিডের দেশ বলা হয় মিশরকে।
- নীলনদের দেশ মিশর।

স্পেশাল টিউশন | কম্পিউটার

মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট

মাইক্রোসফট এক্সেল ও মাইক্রোসফট একসেসের পর আমরা শিখতে চলেছি মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট।

Microsoft Power Point কী?

আপনার কর্ম পরিকল্পনা, কিংবা রিসার্চ করা বিষয় সবার সামনে সুন্দরভাবে উপস্থাপনার জন্য পাওয়ার পয়েন্ট হতে পারে আপনার একান্ত সহযোগী। কিংবা পাঠদানের ক্ষেত্রেও পাওয়ার পয়েন্ট হয়ে উঠবে আপনার কার্যকরি হাতিয়ার।

MS Office-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল Power-Point । একে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বলা হয়। প্রেজেন্টেশন কথার অর্থ হল উপস্থাপন করা। কোনও বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্যকে উপস্থাপন করার পদ্ধতিকে Presentation বলে। যেমন— বিভিন্ন আলোচনা চক্র, বিভিন্ন প্রদর্শনী, সভা-সমিতি কনফারেন্স সেমিনার ইত্যাদি জায়গায় কোনও বিষয় বস্তুর উপর বক্তা তার মতামত দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে উপস্থাপন করে থাকেন। এই উপস্থাপনাকে সাবলীল ও দর্শকদের কাছে আরও বোধগম্য করে তুলতে বক্তা তার বিষয় বস্তুতে বিভিন্ন লেখা, ছবি, সাউন্ড, গ্রাফ ইত্যাদি ব্যবহার করেন। তারপর Projector-এর মাধ্যমে সেগুলি দর্শকের সামনে তুলে ধরেন। আর এই সমস্ত কাজ পাওয়ার পয়েন্টের সাহায্যে সহজেই করা যায়। এছাড়া এরকম অনেক কাজ পাওয়ার পয়েন্টে করা যায়।

বিশ্বায়নের এই যুগে বর্তমান বাজারে দিন দিন পাওয়ার পয়েন্টের চাহিদা অনেক বাড়ছে। যাঁরা পাওয়ার পয়েন্ট জানেন না তাঁরা কাজটি শিখে, দক্ষতার ঝুলিতে আরও একটি সুন্দর বিষয় যোগ করতে পারবেন। যা এই বিশ্বায়নের যুগে আরও একটি ধাপ এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

পাওয়ার পয়েন্টের সাহায্যে যে কাজগুলো করতে পারবেন?

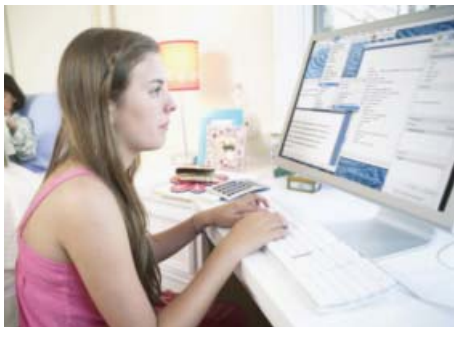

একটি সম্পূর্ণ উপস্থাপনা (Presentation) করা যায়। বিষয়গুলি আলাদা আলাদা স্লাইড (Slide)-এ লেখা যায়। স্লাইড-এর প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন Design (ডিজাইন) দেওয়া যায়। স্লাইডে চ্যাট, গ্রাফ, ছবি, সাউন্ড ব্যবহার করা যায়। স্লাইডগুলি একত্রে একটি ফাইলে (File)-এ Store করা যায়। স্লাইডগুলি প্রয়োজনে প্রিন্ট দেওয়া যায়। Presentation-টিকে Internet-এর মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো যায়। Slideগুলি প্রয়োজনে Edit বা Delete করা যায়। Projector-এর সাহায্যে Slide Show করিয়ে কোনও বিষয় উপস্থাপন করা যায়।

কীভাবে Power Point-এ নতুন স্লাইড নিতে হয়

Power Point-এ প্রেজেন্টেশন তৈরি করার জন্য অবশ্যই স্লাইড ব্যবহার করতে হয়। তাই প্রেজেন্টেশন তৈরি করার জন্য কীভাবে নতুন স্লাইড নিতে হয় সেটি জানা প্রয়োজন।

যখন আপনি পাওয়ার পয়েন্ট প্রোগ্রামটি ওপেন করবেন তখন দেখবেন একটি স্লাইড অটোম্যাটিক দেওয়া থাকবে। কিন্তু একটি স্লাইডে তো আর প্রেজেন্টেশন শেষ করা সম্ভব না, তাই সেখানে নতুন নতুন স্লাইড নেওয়ার প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে নতুন স্লাইড নেওয়ার জন্য রিবনের Home ট্যাবের Slides গ্রুপ থেকে New Slide অপশনে ক্লিক করুন, একটি স্লাইড চার্ট আসবে। স্লাইড চার্টে লক্ষ করলে দেখবেন সেখানে বিভিন্ন স্টাইলের স্লাইড শো করছে। প্রেজেন্টেশনের ধরন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় স্লাইডটি বাছাই করে তাতে ক্লিক করুন। তাহলে দ্বিতীয় স্লাইড হিসাবে সিলেক্ট করা স্লাইডটি পেয়ে যাবেন।

Auto Slide After Open Power Point

পাওয়ার পয়েন্ট প্রোগ্রামটি ওপেন করার পর অটোমেটিক একটি স্লাইড সেখানে পাবেন।

How to Create a New Slide

পূর্বে ব্যবহৃত স্লাইডের উপরে ক্লিক করুন, একটি অপশন মেনু আসবে। অপশন মেনুতে New Slide-এ ক্লিক করুন, তাহলে ব্যবহার করার জন্য নতুন একটি স্লাইড পেয়ে যাবেন। যদি শর্টকাট কি ব্যবহার করতে চান, সেক্ষেত্রে Ctrl + M প্রেস করুন অথবা Enter প্রেস করেও নতুন স্লাইড নেওয়া যায়।

Another Way for creating New Slide

এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন, নতুন স্লাইড নেওয়ার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চার্টে দেওয়া নির্ধারিত স্লাইড স্টাইল ছাড়াও Blank স্লাইড নিয়ে তার উপরে প্রয়োজনমতো স্টাইল অর্থাৎ Text box, Picture, Music, Video ইত্যাদি Insert করতে পারবেন।

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১১ এপ্রিল ২০১৭

উত্তরণ ক্যুইজ

১) উদ্ভিদ দেহে শর্করা কী হিসাবে সঞ্চিত হয়?
২) সৌরজগতে এখন ৮টি গ্রহের মোট উপগ্রহের সংখ্যা কত?
৩) জিনগত তথ্য পরিবহণ করে কোন অ্যাসিড?
৪) ক্ষুদ্রতম করোটি স্নায়ু কোনটি?
৫) তড়িৎ চুম্বক তৈরি করতে কেন কাঁচা লোহা ব্যবহার করা হয়?
৬) মাটিতে খনিজ পদার্থের ঘাটতি মেটানোর সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি কি?
৭) উদ্ভিদের লাল, নীল ও বেগুনি রঙের জন্য কোন রঞ্জক পদার্থ দায়ী?
৮) জনিতৃর সঙ্গে অপত্যের মিলনকে কী বল?
৯) উৎসেচকের প্রকৃতি কী ধরনের?
১০) মানুষের শরীরে খাবারের পরিপাক ও শোষণের কাজ করে কোন অঙ্গ?
১১) টায়ালিন উৎসেচক তৈরি হয় কোন গ্রন্থিতে?
১২) এখনও পর্যন্ত জানা অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংখ্যা কত?
১৩) বাতাসে শব্দের গতিবেগ কত?
১৪) শ্বেতসার ও শর্করাকে একত্রে কী বলে?
১৫) কঠিন বস্তুর মধ্য দিয়ে শব্দের গতিবেগ কত?
১৬) কোন ধরনের রোগের চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়?
১৭) যকৃৎ থেকে বার হয়ে পিত্ত কোথায় জমা হয়?
১৮) জিনগত পরিব্যাপ্তি সংঘটিত হয় কোথায়?
১৯) হকি স্টিক তৈরিতে কোন কাঠ ব্যবহৃত হয়?
২০) দীর্ঘদিনের উদ্ভিদে ফুল ফোটাতে সাহায্য করে কোন হরমোন?
২১) বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহের পথ কেমন?
২২) এককোষী প্রাণী ও উদ্ভিদরা কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত?
২৩) পতঙ্গদের রেচন অঙ্গ কোনটি?
২৪) নিষেক প্রক্রিয়া ছাড়া ফল উৎপন্ন হওয়াকে কী বলে?
২৫) আন্তঃকোষের তরলে কোন খনিজের অস্তিত্ব সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়?
২৬) লাক্ষা বা গালা আসলে কী?
২৭) টাইটান কোন গ্রহের উপগ্রহ?
২৮) সূর্যের ব্যাস কত?
২৯) কোনও বস্তুর ঘনত্ব বলতে কী বোঝায়?
৩০) চাপ পরিমাপ করা হয় কোন এককে?
৩১) জলে শব্দের গতিবেগ কত?
৩২) আলোর ক্ষেত্রে মূল রং কী কী?
৩৩) হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপটন, জেনন ও র‍্যাডন গ্যাসকে একসঙ্গে কী বলে?
৩৪) কোন কোন ধাতু মিশিয়ে ইস্পাত তৈরি হয়?
৩৫) বিমানের এয়ারক্রাফট তৈরি হয় কোন ধাতু দিয়ে?
৩৬) ক্যালসিয়াম অক্সিক্লোরাইড কী নামে পরিচিত?
৩৭) EDTA রক্ত তঞ্চন বিরোধী হিসাবে কোথায় ব্যবহৃত হয়?
৩৮) প্রোটিনের অভাবে শিশুদের কী রোগ হয়?
৩৯) কোথায় সোয়ান কোষ লক্ষ করা যায়?
৪০) কোষ প্রাচীর গঠনে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদান কোনটি?

উত্তর: ১) স্টার্চ। ২) ১৩৪টি। ৩) নিউক্লিক অ্যাসিড। ৪) অপটিক স্নায়ু। ৫) কাঁচা লোহার চৌম্বকত্ব বেশি। ৬) শস্যের আবর্তন। ৭) অ্যান্থোসায়ানিন। ৮) ব্যাক ক্রশ। ৯) প্রোটিনধর্মী। ১০) ক্ষুদ্রান্ত্র। ১১) লালাগ্রন্থিতে। ১২) ২২। ১৩) প্রতি সেকেন্ডে ৩৩০ মিটার। ১৪) কার্বোহাইড্রেট। ১৫) প্রতি সেকেন্ডে ৫০০০ মিটার। ১৬) জীবাণুবাহিত রোগ। ১৭) পিত্তথলিতে। ১৮) ডিএনএ-তে ১৯) স্যালিক্স কাঠ। ২০) জিব্বারেলিন। ২১) বৃত্তাকার। ২২) প্রোটিস্টা। ২৩) ম্যালপিজিয়ান নালিকা। ২৪) পার্থেনোকার্পি। ২৫) সোডিয়াম। ২৬) কীটের শরীর থেকে নিঃসৃত রস। ২৭) শনি। ২৮) ১৩ লাখ ৮৪ হাজার কিলোমিটার। ২৯) প্রতি একক আয়তনের ভর। ৩০) পাস্কাল। ৩১) ১৪০০ মিটার। ৩২) লাল, সবুজ ও নীল। ৩৩) নোবেল গ্যাস বা নিষ্ক্রিয় গ্যাস। ৩৪) লোহা ও কার্বন। ৩৫) ডুরালুমিন। ৩৬) ব্লিচিং পাউডার। ৩৭) ব্লাড ব্যাঙ্কে। ৩৮) ম্যারাসমাস ও কোয়াসিওরকর। ৩৯) স্নায়ুকোষ বা নিউরোনে। ৪০) ক্যালসিয়াম।

বই পড়ার উপকারিতা

প্রথম পাতার পর

সংস্কৃতিবান মানুষেরও জন্ম হবে। সংস্কৃতিমান মানুষের ধর্মই হল অন্যকে সহায়তা করা, মননশীল সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা। বস্তুত যারা বই পড়ে না কিংবা বই পাঠের আনন্দ বা রস যারা উপভোগ করতে জানে না, তারা এক অর্থে মূর্খ। মূর্খদের কাছে জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং বিদ্যার চেয়ে প্রভাব, প্রতিপত্তি ইত্যাদিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এবং এ-সমস্ত কারণেই সমাজে ও রাষ্ট্রে অবক্ষয় দেখা দেয়। ফলে সমাজে বাটপার, ধুরন্ধর, ধড়িবাজ, সন্ত্রাসবাদীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। সুতরাং, এসব উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতেও আমাদের বইয়ের দ্বারস্থ হওয়া উচিত। জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য যেমন বই পাঠের বিকল্প নেই, তেমনি মনের সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশের জন্যও বই পাঠ অপরিহার্য। বই থেকে আমরা যা গ্রহণ করি তা জ্ঞান, প্রজ্ঞা কিংবা বিদ্যা। বই ছাড়া এর কোনওটাই সম্ভব নয়। বর্তমান সভ্য সমাজেও এর সমাধিক প্রয়োজন রয়েছেন। বইয়ের ভেতর যত অজস্র জ্ঞান লুকিয়ে আছে তেমন বোধ হয় আর কোনও কিছুতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে বই সংস্কৃতিমান মানুষ সৃষ্টি করতে পারে, একটা জ্ঞানবান সমাজ গড়ে তুলতে পারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারে, সে বই-ই আমাদের নিত্য পাঠ করা উচিত। কেননা, একটি ভালো বই জীবনের মোড়ও ঘুরিয়ে দিতে পারে। শুধু তাই নয়, একটি ভালো বই আদর্শ বাসগৃহের মতো, গঙ্গার জলের মতো স্নিগ্ধ এবং তৃপ্তিদায়ক। যে কেউ এতে বসবাস করতে পারেন, যে কেউ এতে অবাধে স্নান করে পুণ্য অর্জন করতে পারেন। বস্তুত বই জীবনেরই প্রতীক। আনন্দের প্রতীক এবং অনেক ক্ষেত্রে জীবন বদলে দেওয়ারও প্রতীক। সে কারণেই আমাদের নিত্যনতুন বই পড়া উচিত। জ্ঞান আহরণ ছাড়াও নিজেকে জানাও বই পড়ার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং, আমরা বই পড়ব জ্ঞান বিকাশ-পিপাসা এবং জ্ঞান জিজ্ঞাসা মেটানোর জন্য। আমরা বই পড়ব ভদ্র, মার্জিত এবং সংস্কৃতিমান হওয়ার জন্য। সর্বোপরি আমরা বই পড়ব পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্য।

বই পড়ার আরও অনেক ভালো দিক রয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম হল-

স্ট্রেস কমায়: প্রচণ্ড মানসিক চাপে থাকলে বই পড়ুন। এক গবেষণায় জানা গেছে, মানসিক অবসাদ কমাতে কফি খাওয়া, হাঁটা, গান শোনা ইত্যাদির চেয়ে ভালো একটি বই পড়া অনেক বেশি কার্যকর। বই মনোযোগ ভিন্ন দিকে নিয়ে যায় এবং ফ্রেশ অনুভূতি দেয়।

ইনসমেনিয়া থেকে মুক্তি: গবেষণায় প্রমাণিত যে, বই পড়া আপনার ঘুম না হওয়ার সমস্যাকে স্বাভাবিক করে। অর্থাৎ, আপনি যদি ইনসমনিয়া রোগী হন তাহলে বই পড়াই আপনার রাতের ঘুম ফিরিয়ে দিয়ে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী উপায়। মোবাইল ফোন বা টেলিভিশনের আলো মস্তিষ্কে সিগনাল পাঠায় যে এখন জেগে থাকতে হবে। বিপরীত দিকে হালকা আলোয় বই পড়া মস্তিষ্কে উলটো সিগনাল দেয়।

সহানুভূতিশীল করে: এমনকী কখনও হয়েছে কল্পকাহিনি পড়তে পড়তে একসময় আপনার মনে হয়েছে আপনিও যেন গল্পের একটা অংশ হয়ে পড়েছেন? বই আমাদের মাঝে একটা আবেগের সম্পর্ক তৈরি করে। আমরা গল্পের সঙ্গে সংযুক্ত বোধ করতে শুরু করি। এভাবে নিয়মিত বই পড়া আমাদের বাস্তব জীবনকেও প্রভাবিত করে এবং আমরা ব্যক্তিগত সম্পর্কে আরও সহানুভূতিশীল হই।

মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ায়: ইমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, বই পড়া আমাদের দিনে দিনে আরও স্মার্ট করে তোলে। একটা বই শেষ করার পর বহুদিন পর পর্যন্ত বইটির ইতিবাচক প্রভাব থাকে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, বই পড়ার সময় মস্তিষ্ক এতভাবে কাজ করে যে তা আপনারা নিউরোলজিক্যাল পরিবর্তন ঘটনায় এবং মেমরি মাসলকে উজ্জীবিত করে।

ডিপ্রেশন কমায়: গবেষণা প্রমাণ করে যে, বই পড়া ডিপ্রেশন কমানোর জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। আপনি যদি নিজেই হন নিজের গাইড, তাহলে আপনার খুব কাছের বন্ধু হতে পারে এই বই। প্রেরণা দান করে এমন বই পড়ুন। জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে সাহায্য করে বই। জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয় বই।

উত্তরণ এডু টিপস

পরীক্ষার আতঙ্ক দূর করা

পরীক্ষা। অধিকাংশ ছাত্রের জীবনে যেন এক মূর্তিমান আতঙ্ক। শুনলেই মনে হয় এই বুঝি হালুম করে হামলে পড়বে ঘাড়ের ওপর। অথচ পরীক্ষা মানে কিন্তু সুযোগ। নিজের যোগ্যতাকে প্রমাণ করার, ওপরের ক্লাসে উন্নীত হবার। একবার ভাবো তোমাকে কোনও পরীক্ষা দিতে হবে না। সারাবছর আরামসে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু বিনিময়ে বছরের পর বছর পড়ে থাকবে একই ক্লাসে। কেমন লাগবে তখন? নিশ্চয়ই খুব ভালো না।

পরীক্ষাকে কেন ভয় পাই আমরা?

প্রথম কারণটাই হল আমাদের প্রস্তুতির অভাব। আর এর সমাধান একটাই। তা হল বছরের প্রথম থেকে রুটিন করে পড়া। ভালো রেজাল্টের জন্যে করণীয়গুলো অনুসরণ করা।

ভয়টা অনেক সময় আশপাশ থেকেও সংক্রমিত হতে পারে মনে। এটা সাধারণত হয় খুব ভালো বা খুব খারাপ প্রস্তুতি যাদের, তাদের সঙ্গে কথা বললে। যদি এমন হয় যে তুমি এ ধরনের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হও তাহলে এদের এড়িয়ে চলাই ভালো। কারও কারও ক্ষেত্রে ভয়টা আসে প্রচণ্ড মানসিক চাপ থেকে। যদি পরীক্ষায় ভালো না করি, তাহলে, তো টি-টি পড়ে যাবে! আমাকে সবাই কী ভাববে! —এ জাতীয় ভাবনা যখন মারাত্মক আকার ধারণ করে, তখনই আমরা পরীক্ষাভীতিতে আক্রান্ত হই। এজন্যে পজিটিভ চিন্তার মেডিটেশনটি করতে পারো। পরীক্ষা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরীক্ষাটাই সব নয়।

আমার লেখাপড়াতেই আনন্দ

কথাটা খুব ভালো। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার ক্লাসের ফার্স্টবয়-ফার্স্টগার্ল টাইপের কয়েকজন বাদে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই একথাটা বলতে পারেন না। কারণ, তারা পড়ার আনন্দ খুঁজে পান না। পড়াশোনাটা তাদের কাছে নেহাত পরীক্ষা পাশের প্রয়োজন। আর এর মূল কারণ হলো মনোযোগ দিতে না পারা।

আনন্দের উৎস: মনোযোগ

এখন অনেক কোচিং সেন্টার খুলছে যারা বলে এখানে অমনোযোগী ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ যত্নসহকারে পড়ানো হয়। তাহলে অমনোযোগী ছাত্রছাত্রী বলে কি বিশেষ কোনও গোষ্ঠী আছে? আসলে তা নয়। মনোযোগ বা মেন্টাল এনার্জি প্রয়োগ করার ক্ষমতা প্রত্যেকেরই আছে। ক্লাসের সবচেয়ে অমনোযোগী ছেলেটা যে সারাদিন ক্রিকেট নিয়েই থাকে, তাকে দেখো টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখার সময়। কীরকম মগ্ন আর মনোযোগী! নিজের কথাই ভাবো না! পরীক্ষার আগে যখন ৪ মাসের পড়া করতে হবে ১ সপ্তাহে, তখন কি গভীর আর অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে তুমি পড়তে পারো।

মনোযোগের উপাদান মাত্র দু'টি। এক, আগ্রহ; দুই, পরিবেশ।

১) পড়তে বসার আগে একটু চিন্তা করো— কী পড়বে, কেন পড়বে, কতক্ষণ ধরে পড়বে। প্রত্যেকবার পড়ার আগে কিছু টার্গেট ঠিক করে নাও। যেমন, এত পৃষ্ঠা বা এতগুলো অনুশীলনী।

২) বিষয়ের বৈচিত্র রাখো। নিত্য নতুন পড়ার কৌশল চিন্তা করো।

৩) এনার্জি লেভেলের সঙ্গে আগ্রহের একটা সম্পর্ক আছে। এনার্জি যত বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করার ক্ষমতা তত বেশি হয়। আর অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর দিনের প্রথম ভাগেই এনার্জি বেশি থাকে। তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যে পড়াটা দিনে ১ ঘণ্টায় পড়তে পারছে সেই একই পড়া পড়তে রাতে দেড় ঘণ্টা লাগছে। তাই কঠিন, বিরক্তিকর ও একঘেয়ে বিষয়গুলো সকালের দিকেই পড়ো । পছন্দের বিষয়গুলো পড়ো পরের দিকে।

৫টি জরুরি কাজ

১) রুটিন কেবল দিনের মধ্যে সীমিত না রেখে একে সাপ্তাহিক এমনকী মাসিক কর্মসূচিতে পরিণত করো। অর্থাৎ কাজের সূচি বড় হলে সেটা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে ফেলো।

২) সময়কে ভাগ না করে কাজকে ভাগ করো। ধরো, ১০টায় স্কুলের জন্যে রওনা হওয়ার আগে তোমাকে বেশ কয়েকটি কাজ করতে হবে। স্নান, খাওয়া, পেপার পড়া এবং স্কুলের পড়া তৈরি করা। প্রত্যেকটির জন্য সময় ভাগ না করে রুটিনকে এভাবে সাজাও। ৭.০০-৮.৩০ : মেডিটেশন-স্নান-খাওয়া-পেপার পড়া; ৮.৩০-১০.০০ : স্কুলের পড়া তৈরি ও স্কুলের জন্য তৈরি হওয়া।

৩) দিন শেষে অবশ্য রুটিনটি নিয়ে একবার বসো

যেগুলো করতে পারলে না, সেগুলোর পাশে লাল ক্রসচিহ্ন দাও। সেইসঙ্গে পরদিন ওই না হওয়া কাজগুলো করার চেষ্টা করো।

৪) নিজের প্রতি সদয় হও। অনেকগুলো কাজ একদিনে করার জন্য মোট কত সময় ব্যয় করছ প্রতিদিন? খেয়াল রাখো, তোমার পড়াশোনার সময় যেন এর চাইতে বেশি হয়। অন্তত কম না হয়।

৫) দিনে যদি দুটো ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে, যা করতেই হবে, তবে এর একটি যেন হয় মেডিটেশন। দেখবে বাকি দিন ঠিকমতো কাটবে।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১১ এপ্রিল ২০১৭

বিতর্ক যখন শিক্ষা নিয়ে | আজকের বিষয়: টেলিভিশন

মানুষ একটা সময় টেলিভিশনকে ছোটবাক্স বা বোকাবাক্স বলত। এই সম্বোধনটা হয়তো আকারের কারণেই। কিন্তু আজকের দিনে স্মার্ট টিভি, এইচডি টিভি, প্রোজেকশন টিভি, থ্রিডি টিভি সবকিছুর আকার-প্রকার টিভি সম্পর্কে নতুন করে ভাবাচ্ছে। টেলিভিশন কিংবা টেলিভিশন চ্যানেল আজকের দিনে মানুষের জীবনযাত্রাতেও বদল এনেছে। ঘরের কোনায় রাখা একটা শোপিস কিংবা বিনোদন বাক্স নয়, ছোট বাক্সটা এখন যথার্থই বড় হয়ে উঠছে। একটা সময় লোকে বলত, থিয়েটার হল জীবন, চলচ্চিত্র হল শিল্প আর টেলিভিশন হল আসবাব। যথার্থই একসময়ের এই কথা এখন পুরনো বয়ান হয়ে গেছে।

আলো আর শব্দতরঙ্গ ধারণ করে সেটাকে সবাক আর সচিত্র রূপ দেওয়ার কারিগরি বাহাদুরি দিয়ে যে টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয়েছিল সে টেলিভিশনের বাহাদুরি আজ অনেক বিস্তৃত। মানুষের চাঁদে অভিযান, টুইন টাওয়ারের ধসে পড়া, বিনোদন, খেলাধুলা, সংবাদ, মতামত সকল ক্ষেত্রে টেলিভিশন একটি উপভোগ্য মাধ্যম হয়ে উঠেছে। ব্যক্তি মানুষের তো বটেই রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনাতেও মত ও ভিন্ন মত পর্যবেক্ষণ, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর উন্নয়ন, এমনকী কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণেও টেলিভিশনের গুরুত্ব আজ স্বীকৃত। টেলিভিশনকে যারা বোকা বাক্স কিংবা ওয়ান-টাইম-ইউজ মিডিয়া বলে প্রচার করেছিলেন এখন টেলিভিশনের ব্যাপ্তি পর্যবেক্ষণ করলে তাঁরাই বোকা বনে যাবেন। কোনোরকম তথ্য না দিয়েই বলা যায়, টেলিভিশন ছাড়া আধুনিক মানুষের একটি দিনও যেন রবিনসন ক্রুশোর মতো নিঃসঙ্গ দ্বীপের বাসিন্দার মনে হবে। শুধু ভাবুন, আজ ঘরে গিয়ে আপনার টিভি সেটের রিমোট কন্ট্রোলটি খুঁজে পাচ্ছেন না এবং লক্ষ করুন কী অস্থিরতা আপনার মধ্যে তৈরি হয়। সভ্য মানুষের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক অংশ হিসাবেই টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এটা সত্যি টেলিভিশন একটা মিডিয়া বা মাধ্যম, টুল বা যন্ত্র। এখন একে কীভাবে ব্যবহার করব তার উপরেই নির্ভর করছে টেলিভিশনের অগ্রযাত্রা অথবা ভবিষ্যৎ পথনির্দেশনা। বিশেষ করে বিভিন্ন রকমারি আহ্বান থেকে আজকের ছাত্রসমাজকে কতটা দূরে রাখা দরকার বা তাদের ওপর টেলিভিশনের প্রভাব আজ সত্যি ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিশিকান্ত চক্রবর্তী (শিক্ষক)

টেলিভিশনের ভালো খারাপ দুটো দিকই আছে। তবে ছাত্রজীবনে এর কুফলটাই বেশি বলে আমার মনে হয়। ধরুন এই ধারাবাহিক সিরিয়ালগুলোর কথাই যদি বলা যায় সন্ধে হলেই শুরু হয়ে গেল। স্কুল থেকে ফেরার পর, ছাত্রটির পড়ার ঘর যতই আলাদা হোক না কেন, পড়ার সময় টিভির দিকে মন চলে যাবেই। আর একটা কথা তো অস্বীকার করার কোনও জায়গাই নেই, সেটা হল বাচ্চাদের মনের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে এমন অনুষ্ঠানের তো শেষ নেই। তবে কোনও ভালো প্রোগাম কি নেই? অবশ্যই আছে। শিক্ষামূলক, অনেক প্রোগ্রাম ছাত্রদের ইনসপায়ার্ড করতে পারে, মোটিভেট করতে পারে। তবে সঠিক সময়ে সঠিক জিনিসের মুখোমুখি ছাত্রকে দাঁড় করানো অনেকটাই অভিভাবকের ওপর নির্ভর করে।

বিপাশা বর্মন (ছাত্রী)

আমি টিভি দেখি তবে দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়েই। ক্যুইজ কনটেস্ট,আর্ট অ্যাটাক বা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের বেশ কিছু প্রোগ্রাম দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। কখনও কখনও খেলা দেখি। কখনও কোনও ভালো মুভি হলে দেখি। তবে এমন ব্যাপার নেই যে, সব কাজ বাদ দিয়ে আমাকে টিভি দেখতেই হবে।

বিজন মালাকার (অভিভাবক)

টেলিভিশনের ভালো খারাপ দু'টি দিকই আছে। ছোটদের উপযোগী অনেক ভালো প্রোগ্রামও হয়। বাচ্চার রুচিবোধ তৈরিতে ফ্যামিলির একটা বড় ভূমিকা আছে বলে আমার মনে হয়। মা যদি সন্ধে থেকে টিভির সামনে বসে থাকে, আর বাচ্চা পাশের ঘরে পড়ে, তবে তার মন কিন্তু এদিকে পড়ে না থাকার কোনও কারণ নেই। তাই আমাদের, অভিভাবকদের সংযমী হওয়াটাও জরুরি।

পড়াশোনায় উন্নতি লাভের উপায়

মানস চক্রবর্তী
(আচার্য, সারদা শিশুমন্দির, নিকুঞ্জপুর, বাঁকুড়া)

'লেখাপড়া করে যেই,
গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।
লেখাপড়া যেই জানে,
সব লোকে তারে মানে।'

কীভাবে পড়াশোনা করলে উপরের বর্ণিত অবস্থায় আমরা উপনীত হতে পারব, সেই বিষয়ে অল্পবিস্তর আলোচনার চেষ্টা করা হল।

শুধু পড়াশোনা নয়, জীবনে কৃতকার্য হতে হলে পাঁচটি দিক সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট যত্নশীল হতে হবে।

১) মোটিভেশন: জীবনের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা উচিত। ২) ডিটারমিনেশন: প্রতিকূলতার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। ৩) হেল্‌থ: শরীর ভালো রাখার চেষ্টা। ৪) মেথডিকাল অ্যাপ্লিকেশন: নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে পড়াশোনা করা। ৫) হার্ড লেবার: কঠোর পরিশ্রম। *(আদর্শ ছাত্রজীবন, স্বামী স্বগতানন্দ)*

কীভাবে পড়াশোনা করলে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যাব—

১) পড়াশোনার স্থান: এক্ষেত্রে আমাদের তিনটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে, ক) একটি নির্দিষ্ট স্থানেই পড়াশোনা করতে হবে। কারণ, তাতে মন সহজেই স্থির হয়। খ) বাংলায় একটা প্রচলিত কথা আছে, এক উশখুশ, দুয়ে পাঠ, তিনে গণ্ডগোল, চারে হাট। সুতরাং, অনেকের উপস্থিতি যেখানে, সেখানে আর যাই হোক পড়াশোনা হয় না। নির্জন স্থান যেমন সাধনায় প্রয়োজন, পড়াশোনাতেও তেমনই নির্জন স্থান চাই। গ) স্বামী আত্মানন্দ প্রায়ই বলতেন, 'এভরিথিং মাস্ট বি ইন ইটস প্রপার প্লেস।' অর্থাৎ. প্রত্যেক জিনিস যথাস্থানে রাখা দরকার। এটা হল সুবিন্যস্ত মনের পরিচায়ক। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পড়াশোনায় উন্নতির একটি বিশেষ দিক। টেবিলে বইখাতা স্তূপাকার করা রইল, ঘরময় বই ছড়ানো, এটা অসুন্দর ও বিশৃঙ্খল মনের পরিচয় বহন করে। এতে পড়াতে মন বসে না।

২) পড়াশোনার সময়: পায় প্রতিদিন একই সময়ে পড়তে বসা উচিত। তাতে মন স্থির করতে সুবিধা হয়। কারণ, প্রতিদিন একই সময়ে একই কাজ করলে ওই সময় মন ওই কাজটি করার জন্য তৈরি থাকে। ফলে মন ওই নির্দিষ্ট কাজে সহজেই একাগ্র হয়।

৩) শ্রেণিকক্ষে মনোযোগী হওয়া: শ্রেণিকক্ষে অমনোযোগী হলে আমাদের কয়েকটি ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, ক) সময়ের অপচয়, খ) পাঠ বোধগম্য না হওয়া, গ) শিক্ষকের সঙ্গে সুসম্পর্কের অভাব।

৪) পুরনো পাঠ ঝালাই: ঝালাই (রিভিশন) করার অভ্যেস থাকলে পরীক্ষার আগে কম বেগ পেতে হয়। নিত্য রিভিশন ভালো, হয়ে না উঠলে রবিবার বা ছুটির দিনগুলোতে অবশ্যই করা উচিত। পুরনো পড়া পড়লে, তা আবার নতুন পাঠের মতোই মনে হবে।

৫) যা পড়বে তা লেখার চেষ্টা: মুখস্থ করার পর লিখে নিলে তা মনে রাখা সহজ হয়। কারণ, এতে মস্তিষ্কের সচেতনতা বেশি থাকে। মুখস্থটা লেখার পর বই বা খাতা খুলে মিলিয়ে নাও, প্রয়োজনে বড়দেরও দেখিয়ে নিতে পারো।

৬) প্রতিযোগিতার মনোভাব চাই: প্রতিযোগিতা হল পরীক্ষায় ভালো ফল লাভের অন্যতম উপায়। গ্রামের বা শ্রেণির ভালো ছেলে বা মেয়েটিকে টার্গেট করো। এইরূপ ঈর্ষা না থাকলে পড়াশোনায় উন্নতি ত্বরান্বিত হবে না।

৭) হাতের লেখা যখন সমস্যা: অনেক সময় পরীক্ষা ভালো দিয়েও আশানুরূপ নম্বর ওঠে না। তার জন্য হাতের লেখার অপরিচ্ছন্নতা অনেকাংশে দায়ী। যাদের হাতের লেখা ততটা সুন্দর নয়, তাদের প্রথম দু'পাতা ভালো করে লেখার চেষ্টা করতে হবে। এতে পরীক্ষক তোমার লেখার টানগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন। যাতে পরে হাতের লেখা ততটা সুন্দর না হলেও পরীক্ষকের পড়তে ততটা অসুবিধে না হয়। হাতের লেখা খারাপ হলে পরপর দু'টি শব্দ এবং লাইনের মধ্যে ফাঁক বেশি রাখা দরকার। একটা লাইনে সাত-আটটার বেশি শব্দ না রাখাই ভালো।

৮) লেখার গতি: জানা উত্তরও অনেক সময় ছেড়ে আসতে হয় সময়ের অভাবে। যাদের স্পিড কম, তাদের এই সমস্যাটা হয়। প্রথম প্রথম ঘড়ি ধরে লেখার অভ্যেস করতে হবে। এই লেখাটি আমি এতক্ষণ সময়ের মধ্যে শেষ করবই—এরকম দৃঢ়তা সহযোগে লেখার অভ্যেস চাই। টেস্টপেপার বা প্রশ্নবিচিত্রার উত্তর নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করাটা বাড়িতে বারবার অভ্যেস করতে হবে।

৯) পড়াশোনা-বিষয়ক পত্রপত্রিকা পাঠ: পড়াশোনা-সংক্রান্ত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা বুকস্টল বা পত্রিকা স্টলগুলোতে খোঁজ করলে সহজেই পাওয়া সম্ভব। দৈনিক খবরের কাগজগুলোতেও পড়াশোনা-সংক্রান্ত বিভিন্ন নোট, পরামর্শ থাকে। আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের চোখ-কান খোলা রাখতে হবে।

১০) পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বিভিন্ন রেফারেন্স বই পাঠ: একটি বইয়ে সব প্রশ্নের উত্তর যথাযথ থাকে না। তার জন্য পাঠ্যপুস্তক ছাড়া নানান রেফারেন্স বই পড়লে ভালো ফল মিলবে।

১১) মনোযোগ সহকারে পড়া: 'একাগ্রচিত্ততা এই তপস্যায় সিদ্ধিদান করে। প্রথম কথা এই যে—কী করে পড়তে হয়। একঘণ্টা পড়ো তার হিসাব রাখার দরকার নেই, কীরূপ একাগ্রতার সহিত অধ্যয়ন করো—সেইটাই সবার চেয়ে দরকারি জিনিস। পড়াশুনার উদ্দেশ্য সফল করতে হলে ঘণ্টার উপর নয়, একাগ্রতার উপর নির্ভর করতে হয়।' (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বালি সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রদত্ত বক্তৃতার অংশ)

১২) পড়ার রীতি: কৃতকার্যের চতুর্থ সূত্রটি ছিল 'মেথডিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন'। নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে পড়াশোনা করা। বিষয়ভিত্তিক সংজ্ঞা, সূত্র, ছবি, মানচিত্র ইত্যাদিকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রোজেক্ট এবং প্র্যাকটিক্যালকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া, সহায়ক সামগ্রীর (লার্নিং মেটিরিয়াল) ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। ইতিহাস বা বাংলায় রচনাধর্মী প্রশ্নের ক্ষেত্রে পয়েন্ট ও প্যারাগ্রাফের ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয়।

১৩) কঠোর অধ্যবসায়: কঠোর অধ্যবসায় বা পরিশ্রমের কোনও বিকল্প হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর 'বর্ণপরিচয়'-এ লিখেছেন, 'শ্রম না করিলে লেখাপড়া শেখা যায় না। যে বালক শ্রম করে, সেই লেখাপড়া শিখিতে পারে। তুমি শ্রম করো, তুমিও লেখাপড়া শিখিতে পারিবে।' এই কথা ছাত্রছাত্রীদের সর্বদাই স্মরণে রাখা উচিত।

১৪) মনোযোগ: বাড়ির পাশে বা নিকটে থাকা বুদ্ধিমান দাদা, দিদির কাছে যাওয়া অথবা শ্রেণির বাইরে শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে বাড়তি যোগাযোগ পড়াশোনার গতি বাড়াতে সাহায্য করবে।

১৫) পাঠচক্র (স্টাডি সার্কেল) গঠন: নিজের শ্রেণির বা পাড়ার সহপাঠীদের নিয়ে স্টাডি সার্কেল গঠন করা উচিত। সপ্তাহে একদিন অথবা নির্দিষ্ট দিনে একটা স্থানে জড়ো হয়ে পড়াশোনা বিষয়ে আলোচনা, ক্যুইজ করা যেতে পারে। বড়দের উপস্থিতিতে মাঝে মাঝে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১৬) মুখস্থের কাজ চলুক অন্য সময়েও: হয়তো সকালে পড়তে বসে একটা নোট মুখস্থ করলে, তারপর মা হয়তো তোমাকে দোকানে যেতে বললেন, তুমি দোকান যাওয়া-আসার পথে নোটটা মুখস্থ (মনে মনে) বলতে বলতে গেলে, আবার মুখস্থ বলতে বলতে এলে।

১৭) নিজেকে শিক্ষক ভাবা: নিজেকে শিক্ষক ভাবো। মনে মনে ভেবে নাও তুমি কোনও ছাত্রকে পড়াচ্ছ, তেমনি মনোভাব নিয়ে পড়াশোনা করো—এতে পড়ার কাজটা আনন্দদায়ক হবে।

১৮) নিজে উত্তর লেখার চেষ্টা: বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাসের নোট নিজে তৈরির চেষ্টা করো। এতে লেখার দক্ষতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

১৯) দেওয়ালে প্রেরণাদায়ক বাণী লিখে রাখা: দেওয়ালে উৎসাহব্যঞ্জক বাণী লিখে রাখা যেতে পারে। যেমন কেউ লিখল—'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ', কেউ-বা লিখল, 'পরিশ্রমের কোনও বিকল্প হয় না'। অথবা কেউ মনীষীদের ফোটোও (রামানুজন, বিদ্যাসাগর) রাখতে পারে। তাঁদের অধ্যয়ন স্পৃহাটা প্রেরণার কাজ করতে পারে।

২০) বইখাতার প্রতি যত্নশীল: মানুষ সুন্দরের পূজারি। বইখাতার সৌন্দর্যও পড়ায় মন বসাতে সাহায্য করে। বইখাতায় সুন্দর করে মলাট দেওয়া, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা খাতা বানানো, এসবই হল কার্যকরী পন্থা।

২১) শ্রদ্ধাবান হও: গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম।' শ্রদ্ধাবান মা-বাবা, শিক্ষক গুরুজন, অধ্যয়ন সকলের প্রতিই হওয়া উচিত। কারণ, শ্রদ্ধাবান বা বিনয়ী না হলে লেখাপড়া শেখা যায় না। গুরুকৃপায় শিক্ষালাভের অনেক উদাহরণ আছে—আরুণি, সত্যকাম, জাবাল প্রমুখ।

২২) নিয়মিত খেলাধুলা: একটা প্রচলিত কথা হল, ব্যায়ামের জন্য সময় না দিলে ব্যারামের জন্য সময় দিতে হবে। অপটু স্বাস্থ্য কখনও উচ্চচিন্তা করতে পারে না। স্বামীজি বলেছিলেন, 'গীতাপাঠের চেয়ে ফুটবল খেললে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হবে।' বলার অর্থ, এই শরীরটা সবল হলে পাঠটা অধিক বোধগম্য হবে। এইজন্য ছাত্রছাত্রীদের বিকেলে খেলাধুলো করা উচিতও বটে, দরকারও বটে।

২৩) চাটনি চালাও: 'কোনও গভীর ভাবাত্মক বিষয় অধ্যয়ন করতে করতে ক্লান্তিবোধ হচ্ছে। আর ভালো লাগছে না? আচ্ছা চাটনি চালাও। অর্থাৎ রুচিমতো জমি কোপাও, বাগান করো, কিংবা গান গাও, গল্পের বই বা খবরের কাগজ পড়ো।

এরপর চারের পাতায়

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১১ এপ্রিল ২০১৭

জেনারেল নলেজ:

ডিএনএ রহস্যের নেপথ্য কাহিনী

বৃষ্টি ঘোষ

পরিবারে কোনও নতুন সন্তান আসার পরপরই পরিবারের সব সদস্যদের উৎসাহ থাকে, সে দেখতে কার মতো হয়েছে তা নিয়ে। চোখদুটো মায়ের মতো টানাটানা, নাকটা হয়তো বাবার মতো বোঁচা, এসব নিয়েই থাকে সবার জল্পনা-কল্পনা। মা-বাবা থেকে সন্তানের মধ্যে এসব বাহ্যিক এমনকী চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলোর বাহক হচ্ছে ডিএনএ (ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড)।

বংশগতির ধারক ও বাহক ডিএনএ-এর গাঠনিক রহস্য উদঘাটনকারী নোবেল জয়ী জেমস ওয়াটসন এবং ফ্রান্সিস ক্রিক-এর মতে, ডিএনএ দেখতে প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো। অসমান্তরাল দু'টি প্যাঁচের বাইরের দিকে কাঠামো দেওয়া ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার এবং ফসফেট গ্রুপের অবস্থান। ভেতরের দিকে একটার পর একটা সিঁড়ির ধাপের মতো এডেনিন বেস থাইমিন বেসের সঙ্গে আর গুয়ানিন বেস সাইটোসিন বেসের সঙ্গে হাইড্রোজেন বন্ধনী দিয়ে যুক্ত। ডিএনএর এই গঠন দাঁড় করাতে ওয়াটসন ও ক্রিককে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল এবং সেটাই ছিল খুব স্বাভাবিক। স্বনামধন্য অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের তিনটি দল সে সময় ডিএনএ গঠনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য কাজ করছিল। অন্যদিকে, ছিলেন পর্দার অন্তরালে থাকা মলিকিউলার বায়োলজি সম্পর্কে খুবই অনভিজ্ঞ দু'জন যুবক, প্রাণিবিদ্যায় বিএসসি এবং পিএইচডি করা জেমস ওয়াটসন ও পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করা ফ্রান্সিস ক্রিক। ক্রিকের অবশ্য রসায়ন সম্পর্কে অল্পবিস্তর ধারণা ছিল। নোবেল বিজয় তো দূরে থাক, ডিএনএ রহস্যের উদঘাটনকারী হিসাবে তাঁদের কেউ হয়তো কল্পনায়ও ভাবেননি।

১৯৫১ সালে খুব স্বল্প জ্ঞান নিয়ে আর অনেকটা অন্ধকারে ঢিলছোঁড়ার মতোই ওয়াটসন ও ক্রিক সাহেব ডিএনএ সম্পর্কে তাঁদের প্রথম মডেলটি উপস্থাপন করেন। সেই সেমিনারে উপস্থিতি ছিলেন মরিস উইলকিন্স, রোজালিন্ড ফ্রাংকলিন-সহ লন্ডন কিংস কলেজের আরও দু'জন বিজ্ঞানী। ওয়াটসন ক্রিক শাখাপ্রশাখা-সহ গাছের মতো অদ্ভুত এক মডেল উপস্থাপন করেন, যার ভিতরের দিকে ছিল সুগার ফসফেট এবং তার সঙ্গে লাগানো বাইরের দিকে থাকা নাইট্রোজেন বেস। তাদের উপস্থাপিত এই মডেলটি নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। তাদের মধ্যে ফ্রাংক্লিন ছিলে অন্যতম। তিনি ডিএনএ হেলিক্যাল (প্যাঁচানো) ও ফসফেট গ্রুপের বাইরে থাকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ভুলে ভরা এই মডেল উপস্থাপনের পর ওয়াটসন ও ক্রিকের সুপারভাইজার প্রোফেসর ব্র্যাগ এতটাই হতাশ ও লজ্জিত হলেন যে, তিনি তাঁদের ডিএনএ নিয়ে আর কাজ না করার অনুরোধ করেন।

এতসব সমালোচনার মুখে থেকে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না ওয়াটসন ও ক্রিক। বরং আরও নতুন উদ্যম নিয়ে তারা কাজ করতে শুরু করলেন। তবে তাদের কাজের ধরনটা পালটে গেল, গোয়েন্দাদের মতো তাঁরা এখানে সেখানে ছুটে বেড়ালেন নতুন সূত্রের সন্ধানে, জোগাড় করতে শুরু করলেন সে-সময়ের গণ্যমান্য বিজ্ঞানীদের ডিএনএ নিয়ে গবেষণার ডাটা।

সে-সময় রোজালিন্ড ফ্রাংকলিন ছিলেন এক্স-রে-এর মাধ্যমে ডিএনএ নিয়ে গবেষণায় পথিকৃত। ওয়াটসন তাঁর কাছে গিয়েও হাজির হলেন এবং হেলিক্যাল থিওরির মাধ্যমে জোর দাবি করলেন যে ডিএনএ অবশ্যই হেলিক্যাল (প্যাঁচানো)। আগের মতো ফ্রাংকলিন আবারও ওয়াটসনের বিরোধিতা করলেন যে, ডিএনএ হেলিক্যাল হওয়ার পক্ষে কোনও পোক্ত প্রমাণ নেই। তর্কবিতর্কের এক পর্যায়ে ফ্রাংকলিন এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠলেন যে, মার খাওয়ার ভয়ে ওয়াটসন সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচলেন। নিরাশ মনে ফ্রাংক্লিনের ল্যাব থেকে বের হয়ে আসার সময় দেবদূতের মতো তাঁর সামনে এসে হাজির হল উইলকিন্স। ওয়াটসনের অনেক কাকুতি-মিনতির পর ফ্রাংকলিনকে না জানিয়েই উইলকিন্স ডিএনএ এক্স-রে রিপোর্টটির একঝলক দেখতে দেন তাঁকে। ট্রেনে করে বাড়ি ফেরার পথে সেই ডিএনএ এক্স-রে রিপোর্টের একটা স্কেচ তৈরি করে ফেলেন ওয়াটসন।

আবার নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করলেন দু'জন। প্রায় বছর খানেক আগে তাঁদের সঙ্গে কেম্ব্রিজে এক খ্যাতনামা বায়োকেমিস্ট চারগফের দেখা হয়। ওয়াটসন ও ক্রিক চারগফের দেওয়া তথ্যগুলোকে ডিএনএ

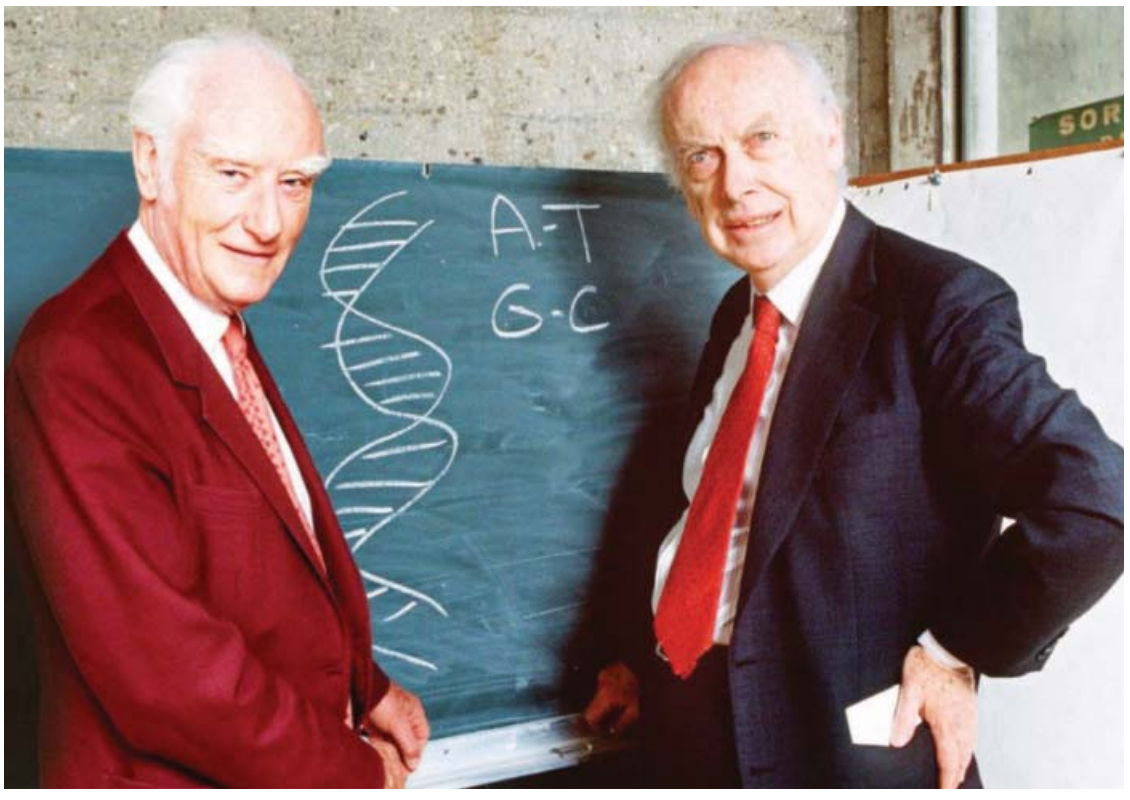

গঠনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের কাজে লাগানো শুরু করলেন। তাদের সেই স্মৃতিও খুব একটা সুখকর ছিল না। ডিএনএতে নাইট্রোজেন বেস এডেনিন-এর সমান সংখ্যক থাইমিন বেস আর গুয়ানিন এর সমান সংখ্যক সাইটোসিন বেস থাকে, চারগফের এই বিখ্যাত সূত্রও তাঁদের জানা ছিল না। চারগফকে অবাক করে দিয়ে ক্রিক নিজেই স্বীকার করেন যে, ডিএনএর চারটি নাইট্রোজেন বেস-এর গঠনও তাঁর কাছে সম্পূর্ণ আজানা।

'Better late than never' দেরিতে হলেও চারগফের তথ্যগুলো ডিএনএ গঠনের রহস্যের কূলকিনারা পেতে বেশ সাহায্যই করেছিল তাঁদের। ফ্রাংকলিনের ডিএনএ এক্স-রে রিপোর্টটি থেকে তাঁরা ধারণা পান যে, নাইট্রোজেন বেসগুলোকে সুগার ফসফেট কাঠামোর ২০ এংসট্রমের মাঝে স্থাপন করতে হবে। বড় আকারের পিউরিন নাইট্রোজেন বেস এডেনিন অথবা গুয়ানিন-এর সঙ্গে ছোট আকারের পাইরিমিডিন নাইট্রোজেন বেস থাইমিন অথবা সাইটোসিনকে হাইড্রোজেন বন্ধনী দিয়ে যুক্ত করে দিতে তা ২০ এংসট্রম জায়গার মাঝে খুব সুন্দর করে সেঁটে যায়। ডিএনএ এক্স-রে রিপোর্টে আর নানা হিসাব-নিকাসের মাধ্যমে তাঁরা আরও জানতে পারেন, যে দু'টি প্যাঁচের প্রতিটি ঘূর্ণনে বেসের সংখ্যা দশ। ট্রিপল হেলিক্স মডেলে তার সমন্বয় করা সম্ভবপর ছিল না। তাই ডিএনএ-র ট্রিপল হেলিক্সের ধারণাও তাঁরা দ্রুত মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেন।

কার্ডবোর্ডের টুকরো নিয়ে অনেকটা বাচ্চাদের মতো খেলার ছলেই ডিএনএ-এর গঠন দাঁড় করে ফেলেন ওয়াটসন ও ক্রিক। ১৯৫৩ সালের ২৫ এপ্রিল জার্নালে প্রকাশিত হয় ৯০০ শব্দের একটি প্রবন্ধ। আর তার লেখক ছিলেন অখ্যাত দু'জন ব্যক্তি ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক।

এর পরের গল্পটা আমাদের অনেকেরই জানা। দু'জন ছন্নছাড়া যুবকের জিরো থেকে রীতিমতো হিরো বনে যাওয়া। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৩ সালে নোবেল বিজয়ীদের খাতায় নাম লিখিয়ে বিজ্ঞানের ইতিহাসে আজও দু'টি স্মরণীয় নাম, জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক।